
ইউক্রেনের
লোককথা





ইউক্রেনের লোককথা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

সংকলক: ভ্লাদিমির বইকো, ভাষাবিদ্যার ডক্টর
মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
শিল্পী: ভ্লাদিমির গার্দচুক

УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

На языке бенгали

UKRAINIAN FOLK TALES

In Bengali

ISBN 5-05-001771-8

সূচী

ইউক্রেনের লোককথা	৭
ডেঁটো-পাঁঠী	১১
দস্তানা	১৯
শেয়ালি দিদি আর ওপর-পড়া নেকড়ে	২৩
খড়ের এঁড়েটা — আলকাতরা গা	৩১
বেড়াল আর মোরগছানা	৩৬
রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদ	৪১
ছাগল আর ভেড়া	৪৬
শেয়ালি দিদি	৫১
সেরকো	৫৯
কুয়োর ভেতর সিংহ	৬৪
মরাল, চিংড়ি আর বোয়াল মাছ	৭১
সিংহের রাজত্ব	৭৫
তেলেসিক	৯১
মায়া ডিম	১০২
রাখাল ছেলে	১১৮
কিরিল চামার	১২৩

উহ্	১২৯
গড়্যানে-মটর	১৪৩
ইভান-প্যালোয়ান	১৬২
উড়ন্ত জাহাজ	১৬৯
চাষির-পো ইভান	১৮৩
লাইম গাছটি আর অতিলোভী বুড়ির কাহিনী	২০৪
বুড়োর মেয়ে আর বুড়ির মেয়ে	২০৮
ধর্মবাপ	২২২
বুদ্ধিমতী	২২৯
ন্যায় অন্যায়	২৩৭

ইউক্রেনের লোককথা

অতি প্রাচীন কাল থেকে পুরুষানুক্রমে লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে নানা ধরনের লৌকিক কাহিনী, মায়াময় এক জগৎ আর তার নায়কদের নিয়ে গল্প, তাতে ঝলক দিয়েছে রসবোধ, বুদ্ধির চমক, জনসাধারণের প্রজ্ঞা। বহুযুগ ধরে কথন ছিল তার অবলম্বন, কথক এককালে তা নিজে শুনে আবার অন্যদের শোনাত। এই 'কথন' থেকেই এগুলির নাম হয়েছে কাহিনী...

অজস্র ইউক্রেনের লৌকিক কাহিনী, তাতে যত নায়ক আর ঘটনার ভিড়, তার কোনোটা খুবই অতীত কালের, কোনোটা আবার তত পুরনো নয়। আশা করি পাঠকদের ভালো লাগবে এ বইয়ের পাত্রপাত্রী, সাধারণ লোকের মধ্যেকার সৎসাহসী সব মানুষদের। আনন্দ দেবে মজার মজার সব কান্ড, পশু-পাখির জ্বলজ্বলে চরিত্র। রূপকথার কাব্যমণ্ডিত নানা ছবিও দেখা যাবে, যেমন যাদু দস্তানা, উড়ন্ত জাহাজ, মহাবীরের ঘোড়া, 'যে আগুন খায়, শিখায় চুমুক দেয়...'

কাহিনী থেকেই দেশের প্রকৃতি, ঘরের পশুপাখি, বন্য জীবজন্তুর সঙ্গে শিশুদের প্রথম পরিচয়। আর সম্ভবত দোলনাতেই অনেক শিশু প্রথম শুনেছে কেমন করে দাদু একবার তার দস্তানা হারিয়ে ফেলেছিল বনে আর কারা কারা তাতে ঠাঁই নিয়েছিল। একেবারে ছোটো থেকেই পশুপাখির মায়াময় মূর্তিগুলো হয়ে ওঠে তাদের প্রিয়, বার বার সানন্দে শুনতে চায় তাদের কথা। আর একটু যখন বড়ো হয়, তখন আসে অন্য সব কাহিনী। অবাক হয়ে তারা শোনে সেয়ানা দিদি শেয়ালি কীসব করছে: ইউক্রেনের

লোককথাগুলিতে গৃহপালিত আর বন্য পশুপাখির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় এই চরিত্রটিকে। এই সেয়ানা শেয়ালির কাছে প্রায়ই জব্দ হয় মোরগ আর খরগোশ, এমনকি নেকড়ে আর ভালুকও। তবে তার পেজোমি আর শয়তানির প্রতিফলও পেতে হয় তাকে।

অকারণে একথা বলা হয় না যে জীবজন্তু নিয়ে গল্পের 'একটা চোখ থাকে মানুষের দিকে।' একই কথা বলা হয় তুলনাগুলিতেও। 'শেয়ালের মতো সেয়ানা', 'নেকড়ের মতো ভক্ষক'। তবে গল্পগুলির স্রষ্টা লোকসাধারণ সর্বদাই লাঞ্ছিতের পক্ষে সহানুভূতি দেখায় তাদের বিপদে-আপদে, ভালোবাসে তাদের ভালোমানুষি, দরদ, বিশ্বস্ততার জন্যে।

সংকলনে রূপকথাও আছে। তাতে কু'য়ের সঙ্গে — নাগ আর ড্রাগনের সঙ্গে সুকঠিন দ্বন্দ্বে ফুটে ওঠে সহজ মানুষ, সাধারণ মেহনতির বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্র। রূপকথার নায়কেরা এসেছে জনগণের মধ্যে থেকে, সে পরিচয় থাকে তাদের নামগুলিতেও — চাষির-পো ইভান, রাখাল ছেলে, কিরিল চামার... নায়কদের নাগমুণ্ড কাটতে হয় কেবল একবারই নয়, মন্দকে শায়েস্তা করতে, বিপন্নকে বাঁচাতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে একাধিক বার লড়তে হয় তাদের। রোমাঞ্চকর তাদের ভাগ্যচক্র আর কীর্তিকাহিনীর কথা বলে গল্পগুলিতে জয়গান করা হয় তাদের সাহস, মহানুভবতা আর ক্ষুরবুদ্ধির।

রূপকথাগুলিতে লোককল্পনায় রূপলাভ করে মহাবীরের শক্তি অর্জন, মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ মেহনতির স্বপ্ন। ইউক্রেনের বহু লোককথায় বর্ণাঢ্য চিত্র থাকে অপ্রাকৃত সামর্থ্যধর সব নায়কদের।

তার লক্ষণ থাকে তাদের নামেও — পাহাড়-ঠেলিয়ে, পাকানো-মোচ, হিমদাদু, ওক-উপড়িয়ে, পাথর-গুঁড়িয়ে প্রভৃতি। বহুকাল থেকে মানুষের অমানুষিক শক্তির কথা ভেবে এসেছে লোকে আর সে স্বপ্ন গেঁথেছে রূপকথার দুরন্ত বয়ানে...

সংকলন শেষ হয়েছে যেসব গল্পে তাতে আমরা দেখব সাধারণ লোকেদের, ইউক্রেনের চাষিদের। তাদের কাজকর্ম, কারিগরি, ঘরকন্না সেইসব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসূচক যেখানে এগুলি রচিত। এসব গল্পের বিষয়বস্তুও ধনী আর গরিব, উদার আর নিষ্ঠুর, যারা ন্যায়পথে চলে আর যারা মনে করে অন্যায় ক'রেও দিন কাটানো যায়, তাদের মধ্যে যা সম্পর্ক তার লক্ষণাক্রান্ত। কাহিনীগুলিতে উপহাস করা হয় জার আর ধনীদের আত্মম্ভরিতা আর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে, সাধারণ যেসব মানুষ দুঃখকষ্টে উত্তীর্ণ হচ্ছে, জয়লাভ করে তাদের ক্ষিপ্রবুদ্ধি, রসবোধ আর সাহস।

লৌকিক কৌতুক আর তীক্ষ্ন শ্লেষে এগুলি উজ্জ্বল, পরের ঘাড় ভেঙে যারা লাভবান হয়, এ শ্লেষ উদ্যত তাদের সবার বিরুদ্ধে।

প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত, গুরুভার শ্রমকে সহজসাধ্য, জীবনযাত্রাকে সুন্দর, অভিশাপ আর অত্যাচারকে পরাস্ত, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সমস্ত লোক যাতে স্বাধীনভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়, অভাব-অনটন না থাকে, তার জন্য সাধারণ মানুষের স্বপ্নে কাহিনীগুলি অনুপ্রাণিত।

কাহিনী সমেত সমস্ত লৌকিক শিল্পকর্মই প্রচলিত থাকে একাধিক রূপভেদে, যা নির্ভর করে স্থান কাল আর স্বয়ং কথকের ওপর। কাহিনীগুলিতেও অবিরাম পরিবর্তন ঘটেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে তা নতুন নতুন শৈল্পিক অনু-উপাদানে।

এ সংকলনের কাহিনীগুলি প্রধানত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত ইউক্রেনের পলতাভা আর কিয়েভ উপপ্রদেশে সংগৃহীত। ইউক্রেন হল সোভিয়েত ইউনিয়নের পনেরটি সমাজতান্ত্রিক অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রের একটি, বিস্তৃত তা কার্পাথীয় গিরিমালা থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত। তার পূর্বে ও উত্তরে রাশিয়া আর বেলোরাশিয়া; দক্ষিণ-পশ্চিমে মোলদাভিয়া।

কাহিনীগুলির রচক ও কথকেরা সুন্দর বর্ণনা করেছেন গ্রামীণ

মেহনতিদের, ইউক্রেনীয় কৃষকদের জীবনযাত্রা আর পরিশ্রম যা তাঁদের সুপরিচিত, দেখিয়েছেন তাদের রীতিনীতি, কাজকারবার, ঘরোয়া পশুপাখি। গল্পগুলি থেকে পাঠকেরা ইউক্রেনের স্বকীয় প্রকৃতির — তার স্তেপ, বন, ছোটোবড়ো পাহাড় আর নদীরও পরিচয় পাবেন। রূপকথার ঐন্দ্রজালিক জগৎ তাঁদের নিয়ে যাবে এই অঞ্চলে, নিপার নদীর তীরে, পরিচয় করিয়ে দেবে নতুন-নতুন নায়কের সঙ্গে, তাদের সাথে একত্রে হবেন উদ্বিগ্ন আর আনন্দিত, নতুন করে দেখবেন কু'-এর ওপর সু'য়ের বিজয়...

বিশ্বের বড়ো বড়ো অনেক সাহিত্যিকই ছিলেন লোককথার মায়া জগতের অনুরাগী, সেখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তাঁরা। লৌকিক কাহিনীর প্রসঙ্গ আর প্রতিমা স্থান পেয়েছে গ্যেটে, শিলার, মিৎস্কেভিচ, পুশ্‌কিন, শেভচেঙ্কো, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অতীত ও বর্তমানের বহু বাণীশিল্পীর রচনায়।

প্রাচীন ভারত থেকে আমাদের কাছে এসেছিল কাহিনীসংকলন 'পঞ্চতন্ত্র', পশ্চিম এশিয়ার আরব জনগণের কাছ থেকে পেয়েছি 'একাধিক সহস্র রজনী'। আর শুধু কি তাই? আনন্দে কচিকাচাদের বুক ভরে তোলে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী, অ্যান্ডারসন আর পেরোর গল্প। কথক সাহিত্যিকেরা নিজেদের জনগণের কাহিনী অবলম্বন করে তাতে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছেন, উপহার দিয়েছেন তা ভূগোলকের সমস্ত শিশুকেই।

যেমন অতীতে, তেমনি বর্তমানে লোককথা আমাদের সাহায্য করছে চারিপাশের জগৎটার দিকে সযত্নে মন দিতে, কাহিনীর চরিত্রগুলি তাদের নিজেদের মতো ক'রে ছোটোদের কাছে মেলে ধরে তার সমস্ত জটিলতা আর বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবনের আনন্দ।

ভ্লাদিমির বইকো

ভাষাবিদ্যার ডক্টর



ডেংটো-পাঁঠী

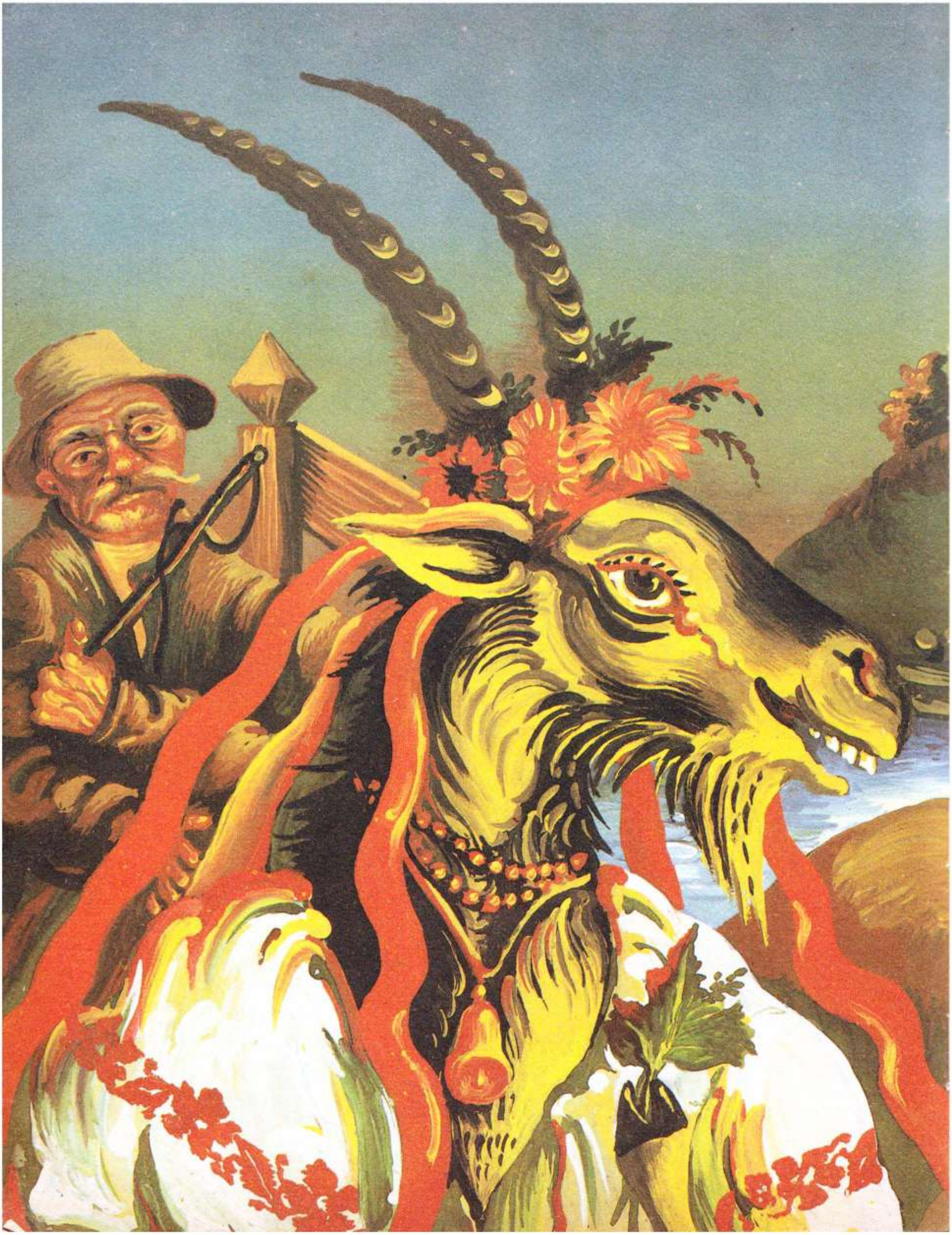
এক-যে ছিল বুড়ো আর বুড়ি। বাজারে গিয়ে বুড়ো একটা পাঁঠী কিনল। বাড়ি নিয়ে এসে রাতে ঘুমাল, পরের দিন বড়ো ছেলেকে বললে পাঁঠীটা চরিয়ে আনতে। ছোকরা পাঁঠী চরায়, চরাল একেবারে সন্ধে পর্যন্ত। সন্ধেয় তাকে নিয়ে চলল বাড়ি। এল বেড়ার দরজা পর্যন্ত, বুড়ো সেখানে তার লাল বুট পরে দাঁড়িয়ে। শুধাল:

'পাঁঠী আমার, ছাগলীটি, জল খেয়েছিস তুই, ঘাস খেয়েছিস?'

'না দাদু, কিছু খাই নি, দাই নি: কেবল সাঁকো দিয়ে যাওয়া, পাতা খুঁটে নেওয়া, খালের পাড়ে ছোটা, একফোঁটা জল জোটা — ওইটুকুনি ভোজন, ওই তেষ্টা মিটন।'

ছেলের ওপর রেগে গেল বুড়ো, দিল তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে।

পরের দিন ছোটো ছেলেকে পাঠাল। ছাগল চরায় সে, চরাল একেবারে সন্ধে অবধি। সন্ধেয় বাড়ি চলল, এল বেড়ার দরজা পর্যন্ত, বুড়ো সেখানে তার লাল বুট পরে দাঁড়িয়ে। শুধাল:



'পাঁঠী আমার, ছাগলীটি, জল খেয়েছিস তুই, ঘাস খেয়েছিস?'

'না দাদু, কিছু খাই নি, দাই নি: কেবল সাঁকো দিয়ে যাওয়া, পাতা খুঁটে নেওয়া, খালের পাড়ে ছোটা, একফোঁটা জল জোটা — ওইটুকুনি ভোজন, ওই তেষ্টা মিটন।'

এ ছেলেটাকেও তাড়িয়ে দিল বুড়ো।

পরের দিন পাঠাল তার বুড়িকে।

ছাগল নিয়ে গেল বুড়ি, চরাল সারা দিন ধরে, সন্ধেয় বাড়ি নিয়ে এল; বুড়ো ওদিকে তার লাল বুট পরে বেড়ার দরজায় দাঁড়িয়ে। শুধাল:

'পাঁঠী আমার, ছাগলীটি, জল খেয়েছিস তুই, ঘাস খেয়েছিস?'

'না দাদু, কিছু খাই নি, দাই নি: কেবল সাঁকো দিয়ে যাওয়া, পাতা খুঁটে নেওয়া, খালের পাড়ে ছোটা, একফোঁটা জল জোটা — ওইটুকুনি ভোজন, ওই তেষ্টা মিটন।'

বুড়িকেও তাড়িয়ে দিল বুড়ো।

চার দিনের দিন নিজেই সে ছাগলী নিয়ে গেল। সারা দিন চরাল, সন্ধেয় বাড়ির পথ ধরল, নিজে গেল আগে আগে, লাল বুট জুতো পরে দাঁড়াল বেড়ার দরজায়, শুধাল:

'পাঁঠী আমার, ছাগলীটি, জল খেয়েছিস তুই, ঘাস খেয়েছিস?'

'না দাদু, কিছু খাই নি, দাই নি: কেবল সাঁকো দিয়ে যাওয়া, পাতা খুঁটে নেওয়া, খালের পাড়ে ছোটা, একফোঁটা জল জোটা — ওইটুকুনি ভোজন, ওই তেষ্টা মিটন।'

রেগে গেল বুড়ো, কামারশালায় গিয়ে ছুরি শানাল, কাটতে গেল পাঁঠীকে। কিন্তু পাঁঠী তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল বনে। বনে ছাগলী দেখতে পেল খরগোশের এক কুঁড়ে, ঢুকল ভেতরে, লুকিয়ে রইল চুল্লির তাকের ওপরে।

বাড়ি ফিরল খরগোশ, দেখে কে যেন বসে আছে। খরগোশ জিগ্যেস করল:

'কে আমার কুঁড়েঘরে?'

আর ছাগলী ওদিকে চুল্লির তাকে বসে বসে আওড়ায়:

আমি ডেঁটো-পাঁঠী,
কেনা তিনটে পয়সায়,
পেটের লোম ফরসা।
চাঁট মারব ক্ষুরে,
শিং বেঁধাব ফুঁড়ে,
হোক না তুই ধাড়ি,
মারব লেজের বাড়ি —
অমনি পাবি অক্কা!

ভয় পেয়ে গেল খরগোশ, পালাল কুঁড়ে থেকে, বসে রইল গাছের তলে। বসে বসে কাঁদে। হঠাৎ এল ভালুক, জিজ্ঞেস করলে:

'কাঁদছিস কেন রে দৌড়-খোশ খরগোশ?'

'না কেঁদে কী করি বলো গো ভালুক, কুঁড়েতে আমার বসে আছে যে এক ভয়ংকর জন্তু!'

ভালুক বললে:

'আমি ওকে ভাগিয়ে দেব!'

ছুটে ঢুকল সে ভেতরে:

'কে রে এই খরগোশের কুঁড়েয়, কে?'

আর চুল্লির ওপর থেকে ছাগল আওড়ায়:

আমি ডেংটো-পাঁঠী,
কেনা তিনটে পয়সায়,
পেটের লোম ফরসা।
চাঁট মারব ক্ষুরে,
শিং বেঁধাব ফুঁড়ে,
হোক না তুই ধাড়ি,
মারব লেজের বাড়ি —
অমনি পাবি অক্কা!

ভয় পেয়ে গিয়ে ভালুক পালাল কুঁড়ে থেকে।

বললে, 'না ভাই দৌড়-খোশ খরগোশ, ভাগাতে পারব না, বাপরে, ভয় করছে!'

ফের খরগোশ এসে বসল গাছের তলে, কাঁদতে থাকল। হঠাৎ এল নেকড়ে, শুধাল:

'কী জন্যে কাঁদছিস রে দৌড়-খোশ খরগোশ?'

'না কেঁদে কী করি বলো নেকড়ে — ছেয়ে-ধেবড়ে, কুঁড়েতে আমার বসে আছে যে এক ভয়ংকর জন্তু।'

নেকড়ে বললে:

'আমি ওকে ভাগিয়ে দেব!'

'কী তোমার সাধ্যি। কত চেষ্টা করল ভালুক, পারল না, তুমি তো কোন ছার।'

'আরে দ্যাখ-না আমি ভাগিয়ে দিচ্ছি!'

কুঁড়ের ভেতর ছুটে ঢুকল নেকড়ে, শুধাল:

'কে ওখানে, কে খরগোশের কুঁড়েয়?'

আর চুল্লির ওপর থেকে ছাগলী আওড়ায়:

আমি ডেঁটো-পাঁটী,
কেনা তিনটে পয়সায়,
পেটের লোম ফরসা।
চাঁট মারব ক্ষুরে,
শিং বেঁধাব ফুঁড়ে,
হোক না তুই ধাড়ি,
মারব লেজের বাড়ি —
অমনি পাবি অক্কা!

ভয় পেয়ে গেল নেকড়ে, কুঁড়ে থেকে দে-ছুট।

'না ভাই দৌড়-খোশ খরগোশ, ভাগাতে পারব না, বাপরে, ভয় করছে!'

ফের খরগোশ এসে বসল গাছের তলায়, কাঁদতে থাকল। হঠাৎ ছুটে এল শেয়ালি, দেখে খরগোশ, শুধাল:

'কাঁদছিস কেন রে দৌড়-খোশ খরগোশ?'

'না কেঁদে কী করি বলো, সেয়ানা-দিদি শেয়ালি, কুঁড়েতে আমার বসে আছে যে এক ভয়ংকর জন্তু!'

শেয়ালি বললে:

'আমি ওকে ভাগিয়ে দেব।'

'কী তোমার সাধ্যি গো শেয়ালি! ভালুক কত চেষ্টা করল, পারল না, নেকড়ে কত চেষ্টা করল, পারল না, তুমি তো কোন ছার।'

'কিন্তু আমিই তাড়াব!'

ছুটে ঢুকল শেয়ালি।

'কে রে, কে এই খরগোশের কুঁড়েয়?'

আর চুল্লির ওপর থেকে ছাগলী আওড়াল:

আমি ড্যাঁটো-পাঁঠী,
কেনা তিনটে পয়সায়,
পেটের লোম ফরসা।
চাঁট মারব ক্ষুরে,
শিং বেঁধাব ফুঁড়ে,
হোক না তুই ধাড়ি,
মারব লেজের বাড়ি —
অমনি পাবি অক্কা!

ভয় পেয়ে গেল শেয়ালি, পালাল কুঁড়ে থেকে।

'না ভাই দৌড়-খোশ খরগোশ, পারব না, বাপ্‌রে, ভয় করছে!'

আবার খরগোশ এসে বসল গাছের তলায়, কাঁদতে থাকল। এই সময় কে জানে কোত্থেকে গুটি গুটি আসে কর্কট-বাগদা চিংড়ি। শুধায়:

'কাঁদছিস কেন রে দৌড়-খোশ খরগোশ?'

'না কেঁদে কী করি বলো, কুঁড়েয় আমার বসে আছে যে এক ভয়ংকর জন্তু!'

কর্কট-বাগদা বললে:

'তা আমি ওকে খেদিয়ে দেব!'

'কী তোমার সাধ্যি! কত চেষ্টা করল ভালুক, পারল না। কত চেষ্টা করল নেকড়ে, পারল না। কত চেষ্টা করল শেয়ালি, পারল না, — তুমি তো কোন ছার!'

'কিন্তু আমিই তাড়াব!'

গুটি গুটি ঢুকল সে কুঁড়ের ভেতরে, শুধাল:

'কে রে, কে এই খরগোশের কুঁড়েয়?'

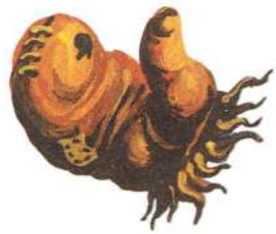
আর চুল্লির ওপর থেকে ছাগলী আওড়ায়:

আমি ডেঁটো-পাঁঠী,
কেনা তিনটে পয়সায়
পেটের লোম ফরসা।
চাঁট মারব ক্ষুরে,
শিং বেঁধাব ফুঁড়ে,
হোক না তুই ধাড়ি,
মারব লেজের বাড়ি —
অমনি পাবি অক্কা!

চিংড়ি ওদিকে গুটি গুটি ওঠে আর ওঠে; উঠে পড়ল চুল্লির ওপরে, হিসিয়ে উঠল:

'নইকো হাঁদা, আমি চিংড়ি, চিমটে ধরব, বুঝবে টেংরি!'

আর পাঁঠীকে এমন কামড় দিলে-না চিংড়ি! একেবারে ব্যা-ব্যা করে গাঙিয়ে চুল্লি থেকে নেমে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে দে-ছুট, টিকিই আর দেখা গেল না! ভারি আনন্দ হল খরগোশের। কুঁড়ের ভেতর এল, ধন্যি ধন্যি করতে লাগল চিংড়ির!.. দিন কাটাতে লাগল নিজের বাড়িতেই।



দস্তানা

বন দিয়ে চলেছে দাদু, পেছন পেছন কুকুরটা। যায়, যায়, যায় — দস্তানাটি ওদিকে পড়ে গেল। ছুটে এল নেংটি ইঁদুর, দস্তানার ভেতর ঢুকে বললে:

'এখানে থাকব আমি।'

এইসময় তিড়িক তিড়িক্ — এল ব্যাঙ। জিগ্যেস করলে:

'কে গো, কে থাকে দস্তানায়?'

'কুটুর-কুটুর নেংটি ইঁদুর। কিন্তু তুমি কে?'

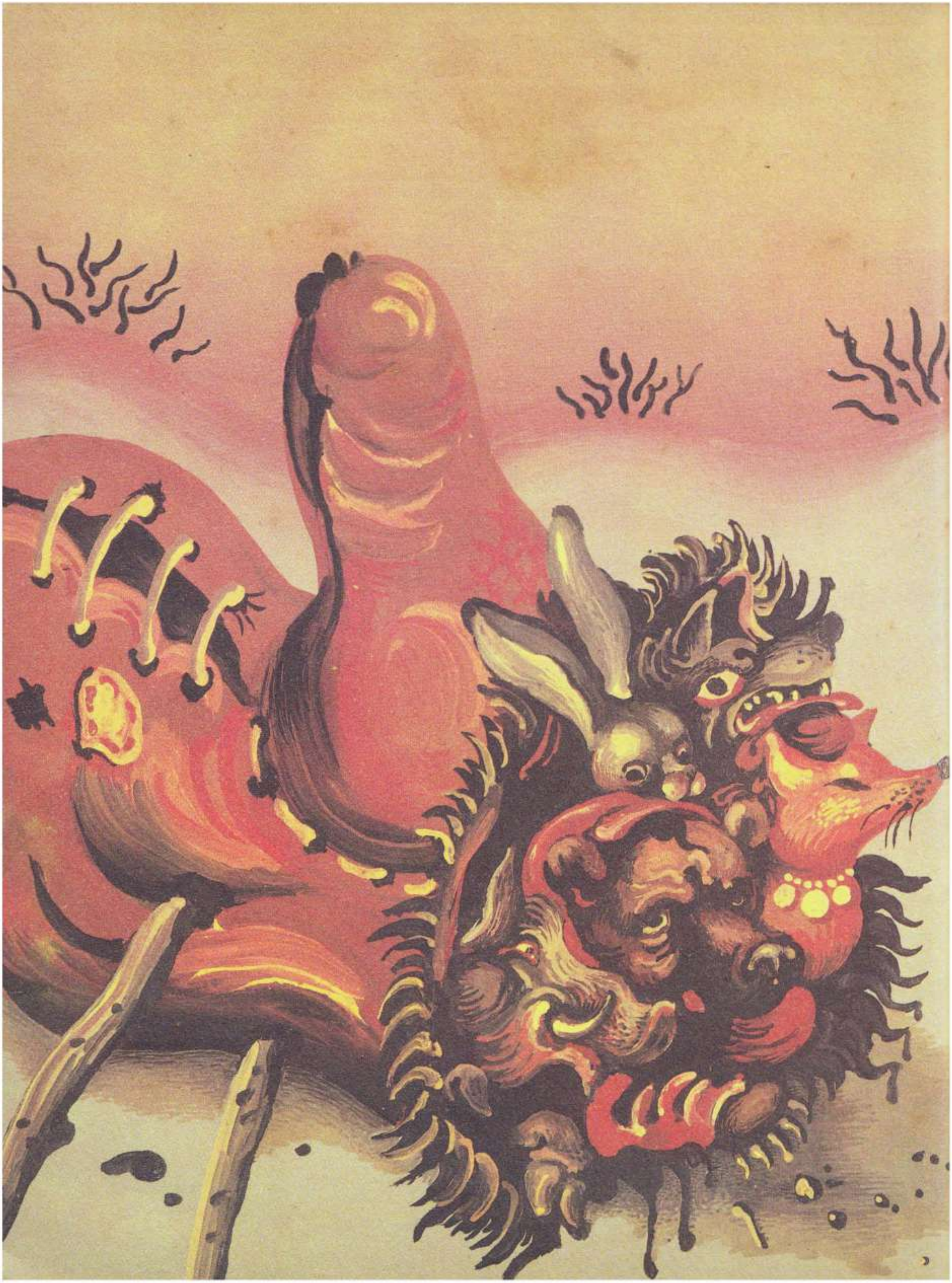
'তিড়িক্-ঠ্যাঙ ব্যাঙ। আমাকেও ঢুকতে দাও!'

'এসো।'

হল ওরা দু'জন। ছুটছিল খরগোশ, দস্তানার কাছে এসে জিগ্যেস করলে:

'কে গো, কে থাকে দস্তানায়?'

'কুটুর-কুটুর নেংটি ইঁদুর, তিড়িক্-ঠ্যাঙ ব্যাঙ। কিন্তু তুমি কে?'



'আর আমি দৌড়-খোশ খরগোশ। আমাকেও ঢুকতে দাও!'

'এসো।'

হল ওরা তিনজন। ছুটে আসে শেয়ালি:

'কে গো, কে থাকে দস্তানায়?'

'কুটুর-কুটুর নেংটি ইঁদুর, তিড়িক্-ঠ্যাঙ ব্যাঙ আর দৌড়-খোশ খরগোশ। কিন্তু তুমি কে?'

'আর আমি সেয়ানা-দিদি শেয়ালি। আমাকেও ঢুকতে দাও।'

তাই চারজনেই বসে রইল তাতে। দ্যাখে, ছুটছে নেকড়ে — সেও দস্তানার কাছে এসে জিগ্যেস করলে:

'কে গো, কে থাকে দস্তানায়?'

'কুটুর-কুটুর নেংটি ইঁদুর, তিড়িক্-ঠ্যাঙ ব্যাঙ, দৌড়-খোশ খরগোশ আর সেয়ানা-দিদি শেয়ালি। কিন্তু তুমি কে?'

'আমি ছেয়ে-ধেবড়ে নেকড়ে। আমাকেও ঢুকতে দাও!'

'তা এসো!'

সেও ঢুকল, হল তারা পাঁচজন। এমন সময়, কে জানে কোত্থেকে — বনশুয়োরের ডাক:

'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ, কে গো দস্তানায়?'

'কুটুর-কুটুর নেংটি ইঁদুর, তিড়িক্-ঠ্যাঙ ব্যাঙ, দৌড়-খোশ খরগোশ, সেয়ানা-দিদি শেয়ালি, ছেয়ে-ধেবড়ে নেকড়ে। কিন্তু তুমি কে?'

'আমি দাঁত-ফোঁড় বনশুয়োর। ঢুকতে দাও আমায়।'

কী বিপদ, সবারই শখ দস্তানায়!

'জায়গা যে আর নেই!'

'কোনোরকমে সেঁধব, ঢুকতে দাও!'

'আহ, পারা যায় না তোমায় নিয়ে, তা সেঁধোও!'

এও সেঁধল। হল তারা ছয়জন, এমন ঘেঁষাঘেঁষি যে পাশ ফেরা যায় না! এইসময় আবার খচমচ করে উঠল ডালপালা: বেরিয়ে এল ভালুক, সেও ঐ দস্তানার কাছে, গাঁ-গাঁ করলে:

'কে গো, কে থাকে দস্তানায়?'

'কুটুর-কুটুর নেংটি ইঁদুর, তিড়িক্-ঠ্যাঙ ব্যাঙ, দৌড়-খোশ খরগোশ, সেয়ানা-দিদি শেয়ালি, ছেয়ে-ধেবড়ে নেকড়ে, দাঁত-ফোঁড় বনশুয়োর। কিন্তু তুমি কে?'

'গাঁ-গাঁ-গাঁ, লোক বড়ো বেশি! আমি বনের তালুকদার ভালুক। ঢুকতে দাও আমায়।'

'কী ক'রে তোমায় ঢুকতে দিই? এমনিতেই আঁটছে না।'

'কোনোরকমে হয়ে যাবে!'

'তা এসো, তবে এক্কেবারে পাশটিতে!'

এও সেঁধল — হল তারা সাতজন, আর এমন আঁটাআঁটি যে দস্তানা ফাটে-ফাটে।

এইসময় দাদুর টনক নড়ল, আরে দস্তানাটা যে নেই। ফিরল সে দস্তানা খুঁজতে। আর কুকুর ছুটল আগে আগে। ছোটে, ছোটে, ছোটে, হঠাৎ দেখে পড়ে আছে দস্তানা, কিন্তু নড়ছে। কুকুর তখন শুরু করল, 'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

ভয় পেয়ে গেল ওরা, দস্তানা থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে যে যেদিকে পারে দে-ছুট। আর দাদু এসে কুড়িয়ে নিল তার দস্তানা।



শেয়ালি দিদি আর ওপর-পড়া নেকড়ে

এক-যে ছিল শেয়ালি, নিজের একটা ঘর বানাল সে। ঘরটা বানিয়ে না সেখানেই দিন কাটাতে লাগল। তারপরে তো ঠান্ডা পড়ল। ঠান্ডায় শেয়ালি জমে যায়, গাঁয়ে ছুটে গেল আগুন আনতে। এল এক বুড়ির বাড়িতে, বলে:

'কুশল গো দিদিমা! পরবের দিন, মঙ্গল হোক তোমার। আমায় একটু আগুন দাও, উপকারের শোধ দেব।'

'তা বেশ শেয়ালি দিদি। বসো, গরম হয়ে নাও, আমি ততক্ষণ চুল্লি থেকে পিঠেগুলো নামাই গে।'

আর বুড়ি তো সেঁকছিল মসলাদার পিঠে। চুল্লি থেকে নামিয়ে সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে জুড়তে দিল। শেয়ালির চোখ ওদিকে বড়োসড়ো লালচে রংধরা পিঠেটার দিকে। খপ্ করে নিয়েই, বাস... ভেতরকার পুরটা



খেয়ে ফেলে তার জায়গায় যতসব আবর্জনা ঢুকিয়ে তার ওপর চটা বসিয়ে পালাল সেটা নিয়ে।

শেয়াল তো ছুটছে, রাখাল ছেলেরা ওদিকে গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে জল খাওয়াতে।

'কুশল গো ছেলেরা!'

'কুশল হোক শেয়ালি দিদি!'

'এসো বদলাবদলি করি, বেড়ে মাল এঁড়ে বাছুরের সঙ্গে মসলাদার পিঠে।'

ওরা বললে, 'বেশ।'

'শুধু এক্ষুনি খেয়ো না, গাঁ থেকে আমি চলে যাবার পর খাবে।'

বদলাবদলি হল। শেয়ালি এঁড়েকে নিয়ে ঢুকে গেল বনে। ছেলেরা পিঠে খেতে লাগল, আর তাতে কেবল আবর্জনা।

শেয়ালি এল নিজের ঘরে, গাছ কেটে স্লেজ বানাল, তাতে এঁড়েটাকে জুতে চালাতে লাগল। দেখে ছুটে আসছে নেকড়ে।

'কুশল গো শেয়ালি দিদি।'

'কুশল হোক নেকড়ে সাঙাত।'

'কোত্থেকে পেলে এই বেড়ে মাল এঁড়ে আর স্লেজটা?'

'বানালাম।'

'আমায় একটু নিয়ে চলো।'

'কোথায় নেব তোমায়? স্লেজ ভেঙে যাবে।'

বলে, 'না, মাত্তর একটা পা রাখব এতে।'

'তা রাখো।'

এইভাবেই চলল খানিকটা, নেকড়ে বলে:

'শেয়ালি দিদি, অন্য পাটাও রাখি।'

'না সাঙাত, স্লেজ ভেঙে যাবে।'

বলে, 'না, না, ভাঙবে না।'

'তা রাখো।'

দ্বিতীয় পাটাও রাখল নেকড়ে। যায়, যায়, হঠাৎ কী যেন মচ্ করে উঠল!

'আহ্ সাঙাত, আমার স্লেজ তুমি ভেঙে ফেলছ।'

'না, না, শেয়ালি দিদি, আমি একটা বাদাম চিবুচ্ছিলাম।'

'দেখো বাপু, সাবধান।'

চলল তারা।

'আরেকটা পাও রাখি শেয়ালি।'

'রাখবে কোথায়? স্লেজ ভেঙে পড়বে, কিসে করে আমি তখন কাঠ বয়ে আনব?'

বলে, 'না, না, ভাঙবে না।'

'তা বেশ, রাখো।'

তিনটে পা-ই রাখল নেকড়ে। ফের কী যেন — মচ্!

'সর্বনাশ!' শেয়ালি বলে, 'এই বেলা ভালোয় ভালোয় চলে যাও সাঙাত, আমার স্লেজ তুমি একেবারেই ভেঙে ফেলবে।'

'আরে না, ও আমি বাদাম চিবুচ্ছিলাম।'

'তা আমাকেও দাও একটা।'

বলে, 'আর নেই, ওটাই ছিল শেষ।'

চলে, চলে, নেকড়ে বলে:

'একেবারেই উঠে বসি শেয়ালি!'

'কোথায় বসবে সাঙাত, স্লেজ যে ভেঙে ফেলবে।'

বলে, 'আমি এই একটুখানি।'

'তা দেখো, সাবধান!'

তারপর নেকড়ে উঠে বসতে না বসতেই স্লেজ একেবারে চুরমার। গালাগালি শুরু করল শেয়ালি। গাল দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বলে:

'তুই অমুক, তুই তমুক, যা কাঠ কাট, স্লেজে কাঠ বোঝাই করে ঠেলে নিয়ে আসবি।'

বলে, 'কী করে কাঠ বোঝাই করি, জানিই না যে কেমন কাঠ দরকার?'

'আরে তুই অমুক, তুই তমুক, কী করে স্লেজ ভাঙতে হয় তা বেশ জানতে, তা ভাঙলেও, আর গাছ ফেলার ব্যাপারে, নেই।' দিলে চুটিয়ে গালাগালি। গালাগালি দিয়ে দিয়ে শেষে বলে, 'বনে ঢুকে বলবি, 'গাছ পড় কেটে, সোজা, গিঁটগিঁটে! গাছ পড় কেটে, সোজা, গিঁটগিঁটে!' '

তা নেকড়ে তো গেল।

বনে ঢুকে বললে:

'গাছ পড় কেটে, গিঁটগিঁটে, গিঁটগিঁটে! গাছ পড় কেটে, গিঁটগিঁটে, গিঁটগিঁটে!'

গাছও কেটে পড়ল। কিন্তু এত খোঁচা খোঁচা ডালপালা তাতে যে লাঠিও হয় না, স্লেজ বানানর তো দূরের কথা।

তেমন গাছই শেয়ালির কাছে নিয়ে এল নেকড়ে। সেটা দেখেই শেয়ালি আবার গালাগালি দিয়ে শ্রাদ্ধ করলে:

'আরে তুই অমুক, তুই তমুক, নিশ্চয় যা বলতে বলেছিলাম, তা বলিস নি?'

'আমি শেয়ালি দিদি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেছি, 'গাছ পড় কেটে, গিঁটগিঁটে গিঁটগিঁটে!' '

'এ আমি আগেই জানতাম! কী হাঁদা তুই ভায়া!.. নে, বসে থাক এখানে, আমি নিজেই কাটব।'

এই বলে চলে গেল।

নেকড়ে বসে আছে, খিদে পেয়েছে তার। শেয়ালির ঘর খুঁজে দেখল, কিছুই নেই। ভেবে ভেবে ঠিক করলে, 'এঁড়েটাকেই খাওয়া যাক, খেয়ে পালাব।'

এঁড়ের গায়ে একটা ফুটো করল সে, ভেতরকার সব মাংস খেয়ে তার মধ্যে চড়ুই পাখি পুরে, খড় গুঁজে ফুটো বন্ধ করে চম্পট।

এল শেয়ালি, স্লেজ বানিয়ে বসল তার ওপর:

'ওরে, বেড়ে মাল এঁড়ে, আয়!'

এঁড়ে কিন্তু নড়ে না। শেয়ালি তখন লাঠি দিয়ে এক ঘা... ঘা মারতেই খড়ের গুঁজিটা খসে পড়ল, ফুরফুর করে বেরিয়ে এল চড়ুই পাখিগুলো। 'আরে তুই হতচ্ছাড়া কুকুর! (কুকুর মানে নেকড়ে আর কি) দাঁড়া, তোকে দেখাব!'

পথের ওপর শুয়ে পড়ল শেয়ালি। শুয়েই আছে — মাছ বইবার গরুর গাড়ি হাঁকিয়ে আসছিল গাড়োয়ানরা; শেয়ালি ভান করে রইল যেন মরা— নড়নচড়ন নেই। গাড়োয়ানরা দেখে শেয়াল। বলাবলি করলে, 'নিয়ে যাই ভায়া, বেচে দেব!' শেষ গাড়িটায় ওকে চাপিয়ে ওরা রওনা দিল। চলছে তো চলছেই। শেয়ালি দেখে, ওরা ফিরে চাইছে না, বাস, শুরু করল গাড়ি থেকে মাছ ফেলতে। একটার পর একটা ফেলেই যায়, আর অনেক যখন ফেলা হল, নিজেও চুপি চুপি নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। গাড়োয়ানরা চলতেই থাকল আর সব মাছ জড়ো করে খেতে শুরু করল শেয়ালি।

দেখে, নেকড়ে ছুটে আসছে!

'কুশল গো, শেয়ালি দিদি!'

'কুশল, নেকড়ে সাঙাত।'

'কী করছ শেয়ালি দিদি?'

'মাছ খাচ্ছি।'

'আমাকেও একটু দাও!'

'যাও, গিয়ে ধরে খাও গে।'

'ধরব কী করে, ধরতে জানি না যে।'

'সে তুমি বোঝ, তোমায় কিন্তু একটা কাঁটাও দেব না।'

'অন্তত আমায় শিখিয়ে দাও কেমন করে ধরতে হয়।'

শেয়ালি ঠিক করলে 'দাঁড়াও, আমার এঁড়েটাকে মেরেছ, এবার তোমায় একটু শিক্ষা দেব।'

বললে, 'চলে যা নদীতে, মাছ ধরার জন্যে বরফের মধ্যে লোকেরা যে ফুটো করে রেখেছে, তার ভেতর লেজ ঢুকিয়ে একটু একটু নাড়াবি আর বলবি: 'মাছেরা ধরা পড়ো, ছোটো আর বড়ো, মাছেরা ধরা পড়ো, ছোটো আর বড়ো,' মাছেরাও অমনি ধরা দেবে।'

নেকড়ে বললে, 'তা শিখিয়ে দিলে যখন, মঙ্গল হোক তোমার।'

নদীতে ছুটে গেল নেকড়ে, বরফের ফুটোয় লেজ ঢুকিয়ে একটু একটু নাড়ায় আর বলে, 'মাছেরা ধরা পড়ো, ছোটো আর বড়ো!' আর হোগলা ঝোপে শেয়ালি আওড়ায়, 'যা জমে যা, যা জমে যা, নেকড়ের লেজা!' ওদিকে বাইরে তখন এমন ঠান্ডা যে সব কটকট করছে।

নেকড়ে কেবলি লেজ নাড়ায় আর বলে, 'মাছেরা ধরা পড়ো, ছোটো আর বড়ো।' আর শেয়ালি: 'যা জমে যা, যা জমে যা, নেকড়ের লেজা।'

জল জমে গিয়ে ফুটোয় লেজ একেবারে আটকে না যাওয়া পর্যন্ত

মাছ ধরার চেষ্টা করে যেতে থাকল নেকড়ে। তখন শেয়ালি গেল গাঁয়ে:

'ওগো ভালোমানুষেরা, যাও সবাই নেকড়ে মারতে।'

লোকেরাও ছুটল খন্তা কুড়ুল নিয়ে। মারল নেকড়েটাকে, দিন ফুরল তার। শেয়ালি কিন্তু আজো পর্যন্ত বাস করছে তার ঘরটিতে।



খড়ের এঁড়েটা — আলকাতরা গা

এক-যে ছিল বুড়ো আর বুড়ি। বুড়ো গাছ কেটে তার রসে আলকাতরা বানাত আর বুড়ি দেখত ঘরকন্না।

বুড়ি ঝোঁক ধরল:

'আমায় একটা খড়ের এঁড়ে বাছুর বানিয়ে দাও!'

'দূর ছাই, খড়ের এঁড়ে নিয়ে কী হবে তোমার?'

'ওকে চরাব।'

কী আর করে বুড়ো, খড়ের এঁড়ে বাছুর বানাল, তার গায়ে মাখাল আলকাতরা।

সকালে বুড়ি তকলি নিয়ে চলে গেল এঁড়ে বাছুরটা চরাতে।

ঢিপির ওপর বসে বুড়ি সুতো কাটে আর আওড়ায়:

'চর, চররে খড়ের এঁড়েটা, আলকাতরা গা! চর, চররে খড়ের এঁড়েটা, আলকাতরা গা!'

সুতো কাটতে কাটতে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।



হঠাৎ ঘুরঘুটি জঙ্গল থেকে, পঞ্চবটী বন থেকে বেরিয়ে এল ভালুক। সোজা গেল সে এঁড়ের কাছে:

'কে রে তুই?'

'খড়ের এঁড়েটা — আলকাতরা গা!'

'আলকাতরা দে, কুকুরের কামড়ে আমার গা ছড়ে গেছে, লাগাব।'

আলকাতরা-গা এঁড়ে চুপ করে থাকে।

রেগে উঠল ভালুক, তার আলকাতরা-মাখা গা আঁকড়ে ধরতেই এঁটে গেল তার সঙ্গে।

ঘুম ভেঙে গিয়ে বুড়ি ডাকে বুড়োকে:

'ওগো, শিগগির ছুটে এসো, এঁড়ে একটা ভালুক ধরেছে!'

ভালুকটাকে ধরে বুড়ো তাকে ফেলে দিল মাটির তলের ভাঁড়ারে।

পরের দিন ফের বুড়ি তকলি নিয়ে গেল এঁড়ে চরাতে। ঢিপির ওপর বসে সুতো কাটে আর আওড়ায়:

'চর, চররে খড়ের এঁড়েটা, আলকাতরা গা, চর, চররে খড়ের এঁড়েটা, আলকাতরা গা!'

সুতো কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুরঘুটি জঙ্গল থেকে, পঞ্চবটী বন থেকে বেরিয়ে এল নেকড়ে। দেখতে পেল এঁড়ে বাছুরকে:

'কে রে তুই?'

'খড়ের এঁড়েটা — আলকাতরা গা।'

'আলকাতরা দে, কুকুরের কামড়ে আমার গা ছড়ে গেছে।'

'নাও।'

আলকাতরা মাখা গা জাপটে ধরতেই লেপটে গেল সে।

ঘুম ভাঙল বুড়ির, চেঁচিয়ে উঠল:

‘ওগো এসো, এসো, এঁড়ে নেকড়ে ধরেছে!’

ছুটে এল বুড়ো, নেকড়েকে ধরে ফেলে দিল মাটির তলের ভাঁড়ারে।

পরের দিনও এঁড়ে চরায় বুড়ি, সুতো কাটে।

কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছুটে এল শেয়ালি। এঁড়েকে শুধোয়:

‘কে রে তুই?’

‘খড়ের এঁড়েটা — আলকাতরা গা।’

‘দে ভাই একটু আলকাতরা, কুকুরের কামড়ে আমার চামড়া ছড়ে গেছে।’

‘নাও।’

শেয়ালিও আটকে গেল। ঘুম ভাঙল বুড়ির, ডাকল বুড়োকে।

শেয়ালটাকেও বুড়ো ফেলে দিল মাটির তলের ভাঁড়ারে।

হ্যাঁ, অনেকগুলো জুটেছে।

ভাঁড়ারের চালের ওপর বসল বুড়ো, ছুরি শানায় আর বলে:

‘ভালুকের ছাল ছাড়াব, চমৎকার কুর্তা হবে!’

তা শুনে ভয় পেয়ে গেল ভালুক:

‘কেটো না আমায়, ছেড়ে দাও! আমি তোমায় মধু এনে দেব।’

‘ঠকাবে না তো?’

‘না, ঠকাব না।’

‘দেখো কিন্তু!’ ছেড়ে দিল ভালুককে।

কিন্তু আবার ছুরিতে শান দিতে বসে। নেকড়ে শুধোয়:

‘ছুরি শানাচ্ছ কেন দাদু?’

‘এই তোর ছালটা ছাড়াব, শীতকালের জন্যে বানাব গরম টুপি।’

‘ছেড়ে দাও আমায়! আমি তোমার জন্যে ভেড়ার পাল তাড়িয়ে আনব।’

‘কিন্তু দেখিস, ঠকাস না যেন!’

নেকড়েকেও ছেড়ে দিলে। আবার ছুরি শানায়।

'বলো-না দাদু, ছুরি শানাচ্ছ কেন?' জিগ্যেস করে শেয়ালি।

বুড়ো বললে, 'তোর ফার বেশ ভালো, আমার বুড়ির জন্যে গরম কলার হবে।'

'না, না, আমার ছাল ছাড়িও না। আমি তোমায় হাঁস-মুরগি এনে দেব।'

'কিন্তু দেখো, ঠকিয়ো না!' শেয়ালিকেও ছেড়ে দিলে।

পরের দিন আলো-আঁধারি ভোরে, দরজায় ঠক-ঠক শব্দ।

'ওগো, দ্যাখো তো গিয়ে দরজায় কে কড়া নাড়ছে।'

গেল বুড়ো, দেখে ভালুক নিয়ে এসেছে পুরো এক চাক মধু।

চাকটা নিয়ে বুড়ো তুলে রাখল, ওদিকে দরজায় আবার ঠুক-ঠুক!

নেকঁড়ে নিয়ে এসেছে ভেড়া। শেয়ালও নিয়ে এল হাঁস আর মুরগি।

বুড়োর আর আনন্দ ধরে না, বুড়িও খুশি। সেই থেকে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল তারা।



বেড়াল আর মোরগছানা

এক-যে বেড়াল আর মোরগছানা। দু'জন দু'জনকে ভারি ভালোবাসত, সর্বদাই থাকত একসঙ্গে, একটা চাষিবাড়িতে। কাঠ আনবার জন্যে বেড়াল একদিন বনে যাবে, মোরগছানাকে বললে:

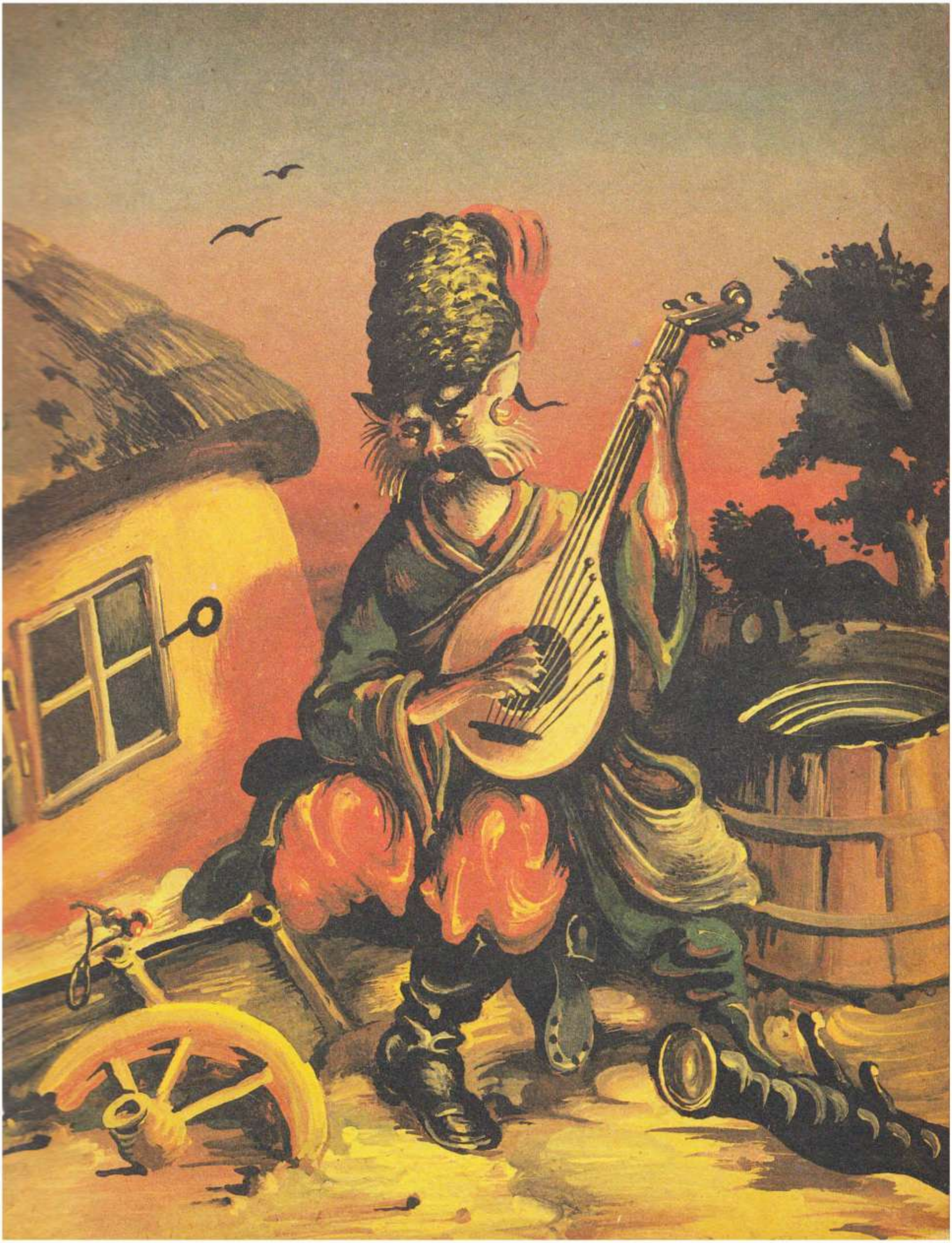
'দেখিস পেতেন্‌কা, চুল্লির তাকে বসে থাকবি, মিঠে রুটি খাবি, কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি না। নিজেও বেরবি না, যতই কেউ ডাকাডাকি করুক। আমায় বনে যেতে হবে কাঠ আনতে।'

'বেশ,' বললে মোরগছানা, বেড়াল বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল ভালো করে।

ছুটে এল শেয়ালি দিদি, কচি মুরগির মাংস সে সাংঘাতিক ভালোবাসে। মোরগছানাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বার করে আনতে চাইল বাড়ি থেকে: 'আয় বেরিয়ে মোরগছানা! আমার আছে মিষ্টি দানা, জল আছে বেশ টলটলে, নইলে যাব জানলা গ'লে।'

মোরগছানা জবাব দেয়: 'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ, বেড়াল হুকুম দেয় নিকো!'

শেয়াল দিদি তখন জানলা ভেঙে মোরগছানার টুঁটি ধরে টেনে নিয়ে



যেতে লাগল। মোরগছানা বেড়ালকে ডাকে, করুণ সুরে গান ধরে: 'ও ভাই বেড়াল, ও-রে, আমায় বাঁচাও-রে! শেয়াল ধরে ঘাড়ে আঁধার বনের পারে, সবুজ মাঠ ছাড়িয়ে, উঁচু পাহাড়ে চড়িয়ে, তরতরে জল পেরিয়ে যাচ্ছে নিয়ে কোথাও। আমায় তুমি বাঁচাও!'

সে গান শুনতে পেল বেড়াল, ছুটে এসে শেয়ালির হাত থেকে মোরগ-ছানাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল বাড়িতে। ফের হুকুম করলে:

'নজর রাখিস, শেয়ালি এলে সাড়া দিবি না, আমি এবার অনেক দূরে যাচ্ছি।' এই বলে চলে গেল।

আর শেয়ালি দেখল বেড়াল চলে যাচ্ছে; অমনি ছুটে এল।

জানলার কাছটিতে এসে ভারি মিষ্টি করে বোঝায়: 'আয় বেরিয়ে মোরগছানা! আমার আছে মিষ্টি দানা, জল আছে বেশ টলটলে, নইলে যাব জানলা গ'লে।'

মোরগছানা আর পারল না, সাড়া দিলে: 'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ, বেড়াল হুকুম দেয় নিকো!'

শেয়ালিও অমনি ভেতরে ঢুকল জানলা দিয়ে, পেট পুরে খেল সুরুয়া আর জাউ, মোরগছানার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। মোরগছানাও গান ধরলে: 'ও ভাই বেড়াল, ও-রে, আমায় বাঁচাও-রে! শেয়াল ধরে ঘাড়ে আঁধার বনের পারে, সবুজ মাঠ ছাড়িয়ে, উঁচু পাহাড়ে চড়িয়ে তরতরে জল পেরিয়ে যাচ্ছে নিয়ে কোথাও। আমায় তুমি বাঁচাও!'

একবার গাইল, কেউ আসে না, আবার গাইল — ছুটে এল বেড়াল। ফের সে মোরগছানাকে শেয়ালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল বাড়িতে। আরো কড়া করে হুকুম দিলে:

'বসে থাকবি পেতেন্‌কা, চুল্লির তাকে, মিঠে রুটি খাবি, আর শেয়ালি যখন আসবে, তোকে ডাকাডাকি করবে, দেখিস সাড়া দিস নে! আমি

যাচ্ছি দূরে, অনেক দূরে, তখন যতই চেঁচাস, শুনতে পাব না!'

চলে গেল বেড়াল, বাস, শেয়ালিও অমনি হাজির: 'আয় বেরিয়ে মোরগছানা! আমার আছে মিষ্টি দানা, জল আছে বেশ টলটলে, নইলে যাব জানলা গ'লে।'

এবারেও মোরগছানা আর পারল না, সাড়া দিলে: 'কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ, বেড়াল হুকুম দেয় নিকো।'

জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঢুকল শেয়ালি, সুরুয়া আর জাউ খেল পেট পুরে, মোরগছানার ঘাড় ধরে টেনে দিয়ে যেতে লাগল। মোরগছানা একবার গাইল, তিন বারের বারও ডাকল গান গেয়ে... না, বেড়াল চলে গেছে দূরে, অনেক দূরে, কানে গেল না তার।

মোরগছানাকে বাড়িতেই এনে ফেলল শেয়ালি।

বন থেকে বেরল বেড়াল — মোরগছানা নেই। ভারি দুঃখু হল তার। ভাবতে লাগল। ভেবে, ভেবে এক বুদ্ধি করল: বান্দুরা* আর রঙচঙে থলি নিয়ে রওনা দিল শেয়ালির বাড়ির দিকে।

শেয়ালি বাড়ি ছিল না, শিকারে বেরিয়েছে। ঘরে ছিল তার চারটি মেয়ে আর ছেলে ফিলিপক।

তা বেড়াল গেল জানলার কাছটিতে, বান্দুরা বাজায় আর ভারি মোলায়েম করে বলে: 'আহা, শেয়ালির নতুন ঘরের জন্যে ফুটফুটে চার কন্যে, আরো একটি মোহন, ফিলিপক খোকন! দ্যাখো বেরিয়ে এসে, আঙিনাটায় কে সে, বাজায় কেমন বাজন!'

বড়ো মেয়ে আর থাকতে পারল না, ছোটোদের বললে:

'তোরা বসে থাক, আমি গিয়ে একটু দেখি কে এমন মোলায়েম করে বাজাচ্ছে।'

---

* ইউক্রেনীয় তারযন্ত্র। — সম্পাঃ

সে বেরতেই কপালে তার চাঁটি মেরে বেড়াল তাকে পুরে ফেলল তার থলিতে। তারপর ফের গান ধরে: 'আহা, শেয়ালির নতুন ঘরের জন্যে ফুটফুটে চার কন্যে...'

মেজ মেয়েটিও আর পারল না, ছুটে বেরল বাড়ি থেকে, বেড়ালও তার কপালে চাঁটি মেরে ঢুকিয়ে ফেলল থলিতে। তারপর আবার আগের মতোই বান্দুরা বাজায়, মোলায়েম করে গায়: 'আহা, শেয়ালির নতুন ঘরের জন্যে ফুটফুটে চার কন্যে...'

বেরল মেজো মেয়ে, তারও কপালে চাঁটি, বেরল ছোটোটিও — তারও। ছুটে বেরল ফিলিপক খোকন — তাকেও। পাঁচটি শেয়ালছানাই এখন রঙচঙে থলির মধ্যে — টুঁ শব্দটি নেই। দড়ি দিয়ে থলির মুখ বন্ধ করে বেড়াল গেল শেয়ালির বাড়ির ভেতরে, চেয়ে দেখে মোরগছানা পড়ে আছে বেঞ্চির ওপর, পালক ওপড়ানো, একটা ঠ্যাং টেনে ছেঁড়া। ওদিকে চুল্লিতে জল গরম হচ্ছে — তাকে সেদ্ধ করার জন্যে।

মোরগছানার লেজ ধরে বেড়াল বললে:

'পেতেন্‌কা রে, ভাইটি আমার, গা ঝাড়া দে!'

গা ঝাড়া দিল মোরগছানা, চাইছিল পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াবে, ডেকে উঠবে, কোথায় — একটা ঠ্যাঙই নেই! বেড়াল ছেঁড়া ঠ্যাঙটা কুড়িয়ে তার আগের জায়গায় কোনোরকম করে বসাল, পালকগুলো গুঁজে দিল, মোট কথা মেরামত করা হল।

তারপর শেয়ালির বাড়িতে যা ছিল সব তারা খেল, ঘটিবাটি সব ভাঙল, থলি থেকে শেয়ালছানাদের ঝেড়ে ফেলে বাড়ি ফিরে এল।

সেই থেকে আজ অবধি নিজেদের বাড়িতে তারা চুপচাপ থাকে, খায় দায়, দিন কাটায়। আর বেড়াল যা-ই বলুক, সব শোনে মোরগছানা। বিপদে পড়ার পর শিক্ষা হয়েছে।



রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদ

ছিল একটা লোক, ছিল তার একটা বেড়াল, কিন্তু এতই বুড়ো যে ইঁদুর ধরতে পারত না। বাড়ির কর্তা ভাবলে, 'এ বেড়াল দিয়ে আমার কী হবে? নিয়ে যাই, বনে ছেড়ে দিয়ে আসি।' তাই নিয়ে গেল।

আমাদের বেড়ালটি ফারগাছের তলে বসে বসে কাঁদে। ছুটে আসে শেয়ালি দিদি। শুধোয়:

'তুমি কে গা?'

বেড়াল তার লোম ফুলিয়ে বললে:

'হুঁ-হুঁ-হুঁ, আমি রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদ!'

এমন গণ্যমান্য এক মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় ভারি আনন্দ হল শেয়ালির। বললে:

'আমায় বিয়ে করো। ভালো বৌ হব আমি। খাওয়াব তোমায়।'

'বেশ,' বেড়াল বললে, 'তা বিয়ে করা যাক।'

কথাবার্তা হয়ে গেল, শেয়ালির বাড়িতে থাকতে লাগল তারা।

সবরকমে শেয়ালি তোয়াজ করত তার: কখনো মুরগি নিয়ে আসত,



কখনো বনের এটা সেটা কোনো একটা জীব। নিজে খাক, না খাক, ওকে খাওয়াত।

একদিন তার সঙ্গে দেখা হল দৌড়-খোশ খরগোশের, সে বললে:

'শেয়ালি দিদি, আমি তোমার বাড়ি আসব বিয়ের পাকা কথা কয়ে নেবার জন্যে।'

'না, না, কখখনো এসো না! আমার বাড়িতে এখন থাকে রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদ। তোমায় কামড়ে কুটিকুটি করে দেবে।'

বেড়াল বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। লোম ফুলিয়ে পিঠ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করল, 'ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্!'

ভয়ে খরগোশ মরেই বুঝি, বনে ছুটে গিয়ে নেকড়ে, ভালুক আর বনশুয়োরকে বললে কী ভয়ংকর এক জন্তু দেখেছে সে — রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদ।

ওরা ভাবতে লাগল কী করে মার্জারচাঁদের নেকনজরে পড়া যায়, ঠিক করলে শেয়ালির সঙ্গে তাকে খেতে ডাকবে।

পরামর্শ করতে লাগল অতিথির জন্যে ভালোমন্দ কী রান্না করা যায়।

নেকড়ে বললে:

'আমি যাব চর্বি আর মাংসের জন্যে যাতে সুরুয়াটা হয় ভালো।'

বনশুয়োর বললে:

'আমি বীট আর আলু খুঁড়ে আনব।'

ভালুক বললে:

'খাওয়া শেষের মিষ্টিমুখ হিশেবে আমি নিয়ে আসব মধু।'

আর খরগোশ ছুটল বাঁধাকপির খোঁজে।

রান্না হল, খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে তর্ক বাধল কে শেয়ালি আর মার্জারচাঁদকে নিয়ে আসবে।

ভালুক বললে:

'আমি মুটকো, হাঁপিয়ে যাব।'

বনশুয়োর বললে;

'আমি জবরজং, পেরে উঠব না।'

নেকড়ে বললে:

'আমি বুড়ো, কানে কম শুনি।'

খরগোশকেই যেতে হল।

শেয়ালির গর্ত পর্যন্ত ছুটে গিয়ে জানলায় তিনবার টোকা দিল সে: টুক-টুক-টুক!

বেরিয়ে এল শেয়ালি, দেখে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খরগোশ।

জিগ্যেস করলে, 'কী চাই তোমার?'

'নেকড়ে, ভালুক, বনশুয়োর আর আমি তোমাদের, শেয়ালি দিদি তোমায় আর রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদকে আমাদের ওখানে খেতে নেমন্তন্ন করছি।'

বলেই পালাল। ছুটে যখন এল, ভালুক তাকে শুধোয়:

'ওরা যেন চামচে সঙ্গে নিয়ে আসে সেটা বলতে ভোলো নি তো?'

'এই যাঃ মনে ছিল না!' খরগোশ বললে, আবার ছুটল শেয়ালির কাছে।

ছুটে এসে টোকা দিল জানলায়।

বললে, 'সঙ্গে চামচে নিতে ভুলো না।'

শেয়ালি বললে:

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভুলব না।'

শেয়ালি দিদি তৈরি হয়ে নিল, রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদের হাত ধরে এগুতে থাকল। মার্জারচাঁদ ওদিকে আবার লোম ফোলায়, ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে।

চোখ এমন জ্বলছে যেন সবুজ দুটো আগুন।

নেকড়ে ভয় পেয়ে গেল, বসে পড়ল ঝোপের পেছনে, বনশুয়োর ঢুকল টেবিলের তলায়, ভালুক আঁকুপাঁকু করে কোনোরকমে উঠে পড়ল গাছে আর খরগোশ লুকিয়ে পড়ল তার গর্তে।

ওদিকে টেবিলে মাংসের গন্ধ পেতেই বেড়াল হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর, ডেকে উঠল, 'ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও।'

আর জন্তুদের মনে হল সে বুঝি বলছে, 'কমম্-কমম্-কমম্!'

ভাবল, 'পেটুক, এত সবেও কুলচ্ছে না।'

রায়বাহাদুর মার্জারচাঁদ খেল, পান করল, টেবিলের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বনশুয়োর ওদিকে টেবিলের তলে পড়ে থেকে লেজ নাড়াচ্ছে। বেড়াল ভাবল ওটা ইঁদুর। তার দিকে যেতে গিয়েই দেখে সেটা বনশুয়োর, ভয় পেয়ে সে উঠতে লাগল সেই গাছটায় যেখানে বসে ছিল ভালুক।

ভালুক ভাবলে বেড়াল লড়তে আসছে, উঠে পড়ল সে আরো ওপরে। তার ভারে ভেঙে গেল ডাল, ভালুক পড়ল মাটিতে।

আর পড়বি তো পড় ঠিক সেই ঝোপটার ওপর যেখানে বসে ছিল নেকড়ে। নেকড়ে ভাবলে দফা শেষ, একেবারে দে-ছুট। নেকড়ে আর ভালুক এত জোরে ছুটছিল যে খরগোশও তাদের নাগল ধরতে পারছিল না।

আর বেড়াল আবার উঠে এল টেবিলে, খেতে শুরু করল চর্বি মধু দিয়ে মিষ্টিমুখ। যা ছিল সব খেয়ে দেয়ে শেয়ালি দিদি আর বেড়াল চলে গেল বাড়িতে।

নেকড়ে, ভালুক, বনশুয়োর আর খরগোশ একসঙ্গে বলাবলি করলে:

'হ্যাঁ, জন্তু বটে! ওইটুকুনি, কিন্তু আমাদের সবাইকেই প্রায় খেয়ে ফেলছিল আর-কি!'



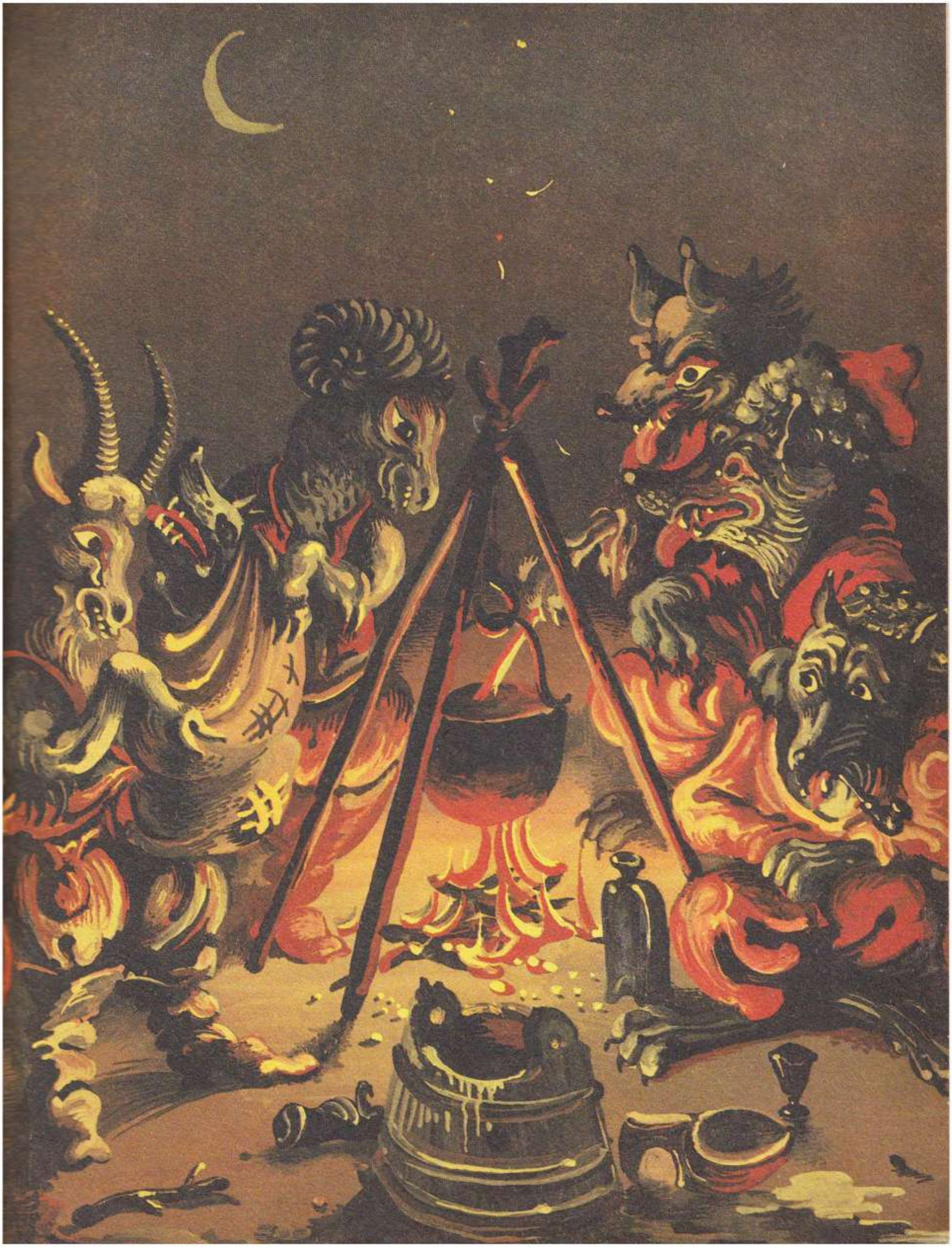
ছাগল আর ভেড়া

এক-যে ছিল ব্বড়ো আর ব্বড়ি। তাদের ছিল একটা ছাগল আর একটা ভেড়া। ছাগল আর ভেড়ার মধ্যে ভারি ভাব: যেখানে ছাগল, ভেড়াও সেখানে; শবজি ভুঁইয়ে ছাগল ঢুকল বাঁধাকপি খেতে, ভেড়াও; ছাগল গেল বাগানে, ভেড়াও তার পেছ্ব পেছ্ব।

ব্বড়ো বললে, 'আহ্, পারি না গিন্নি — ছাগল, ভেড়াকে খেদাতে হয়, নইলে আমাদের শবজি ভ্বঁইও থাকবে না, বাগানও থাকবে না! ...এ্যাই, ভাগ তো, তোদের টিকিও যেন আর না দেখি!'

তা ছাগল আর ভেড়া একটা বস্তা বানিয়ে নিয়ে চলে গেল।

যেতে, যেতে, যেতে দেখে মাঠের মধ্যে পড়ে আছে একটা নেকড়ের মাথা। ভেড়া তো তাগড়াই, কিন্তু সাহস তেমন নেই, আর ছাগল বেশ সাহসী। কিন্তু নেই তেমন একটা তাগদ।



'নে ভেড়া, মাথাটা তুলে নে, তুই তো তাগড়াই।'

'না বাবা, তুই তুলে নে ছাগল, তুই সাহসী।'

দু'জনে মিলেই তুলল মাথাটা, বস্তায় ঢোকাল। আবার যায় তারা, যায়, যায়, দেখে আগুন জ্বলছে।

'চল, আমরাও যাই ওখানে, রাত কাটাব ওখানেই, নেকড়েয় খাবে না।'

গেল সেখানে, দেখে নেকড়েরা সেখানে জাউ রাঁধছে।

'কুশল হে, বাহাদুররা!'

'কুশল, কুশল!.. জাউ সেদ্ধ হোক, ততক্ষণ তোমাদের মাংসটায় কিছু পেট ভরানো যাক।'

ভেড়া তখন ভয় পেয়ে গেল, আর ছাগল তো অনেক আগে থেকেই ভয়ে কাঠ। তবু ছাগলই বললে:

'বার কর ভেড়া ভায়া, নেকড়ের মুন্ডুটা!'

মুন্ডু বার করল ভেড়া।

ছাগল বললে, 'আরে ওটা নয়। বড়ো সড়ো একটা!'

ভেড়া আবার বার করল সেই একই মুন্ডু।

'আরে না! সবচেয়ে বড়োটা দে!'

তখন ভয় পেয়ে গেল নেকড়েরাই; ভাবনা-চিন্তা শুরু হল, তাড়াতাড়ি পিটটান দিতে পারলে হয়। দেখ কান্ড, বাপরে, একটার পর একটা নেকড়ের মুন্ডু বার করছে!

একটা নেকড়ে শেষে বললে:

'খাসা একটা দল জুটেছে ভাইসব, জাউও দিব্যি ফুটছে, তবে আরো খানিকটা জল দিতে হয়, কিন্তু জল নেই। যাই জল নিয়ে আসি।'

খানিকটা দূরে যেতেই ঠিক করল: 'মরো গে তোমরা তোমাদের ভোজ নিয়ে!' বাস, কেটে পড়ল।

তখন আরেকটা নেকড়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করল কী করে পিটটান দেওয়া যায়।

বললে, 'বেটা হারামজাদা, গেল আর পাত্তা নেই; ওদিকে জাউয়ে জল ঢালতে হয়। যাই লাঠিপেটা করে নিয়ে আসি ওকে।'

গেল, সেও আর ফিরল না। আর তৃতীয়টি বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত বললে:

'এবার আমিই যাব! সবকটাকে টেনে নিয়ে আসব।'

বাস, পালাল। প্রাণটা যে যায় নি তাতে আনন্দে আর বাঁচে না। ওদিকে ছাগল ভেড়াকে বলে:

'নে ভায়া, চটপট! ভাববার-টাববার সময় আর নেই। জাউটা খেয়ে নিয়ে প্রাণ থাকতে থাকতে চল পালাই।'

প্রথম নেকড়েটা এই সময় ভেবে-চিন্তে বললে:

'এ কী, বলো দেখি ভাইসব, ভয় পেলাম কিনা ছাগল আর ভেড়াকে? চল যাই, খেয়ে ফেলি গে ওই হারামজাদা বেটাদের!'

এল ওরা, আর ও-দুটি ততক্ষণে জাউটা সাবাড় করে আগুন নিভিয়ে উঠে বসেছে উঁচু ওকগাছে। বসেই আছে। আর সেই ওকগাছের তলেই বসে নেকড়েরা ভাবনা-চিন্তা করছে কিভাবে ছাগল আর ভেড়াকে ধরা যায়। আর ওপর দিকে তাকাতেই দেখে গাছে বসে আছে ওরা। ছাগল সাহসী — উঠেছে সে একেবারে ডগায়, ভেড়া একটু ভীরু, সে রয়েছে নিচে।

সবচেয়ে ঝাঁকড়া-লোম নেকড়েকে তারা বললে, 'তুমি আমাদের মধ্যে বড়ো, তুমিই ভেবে ঠিক করো কী করে ওদের ধরা যায়।'

লোমশ নেকড়ে শুয়ে পড়ল গাছের নিচে, ভাবতে লাগল। আর গাছের ডালে বসে ভেড়া কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে আর পারল না, পড়েই গেল নেকড়েটার ওপর। ছাগল আর দেরি করল না, অমনি চেঁচিয়ে উঠল:

'দে তো আমায় ওই ঝাঁকড়া-লোমটাকে!' এই বলে সেও মাথা নিচু করে গাছটা থেকে পড়ে গেল নেকড়েদের ওপর।

পড়ি-মরি ছুটল নেকড়েরা, ধুলোর মেঘ উঠল তাদের পেছনে।

ছাগল আর ভেড়া চলে গেল, ঝুপড়ি বানিয়ে নিল নিজেদের, সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল সেখানে।

শেয়ালি দিদি

মুরগি চুরি করে শেয়ালি ছুটল। ছুটতে ছুটতে ছুটতে নেমে এল ঘোর-ঘুরঘুটি রাত। দেখে এক চাষিবাড়ি, গেল সেখানে; নিচু হয়ে কুর্নিশ করলে, বললে:

'কুশল গো ভালোমানুষেরা!'

'কুশল শেয়ালি দিদি।'

'ভেতরে আসতে দাও, রাত কাটাই এখানে।'

'হায় রে শেয়ালি দিদি, আমাদের এখানে ঠাসাঠাসি, তোমায় শুতে দেবার জায়গা হবে না।'

'ও কিছু না, আমি ওই বেঞ্চির তলে গুটিশুটি ঢুকব, লেজটা টেনে নেব, রাতটুকু কেটে যাবে।'

বাড়ির লোকেরা বললে:

'তাহলে বেশ, রাত কাটাও!'

'কিন্তু মুরগিটা কোথায় রাখি?'



'রেখে দাও চুল্লির তলে।'

তাই রাখল সে। আর রাতে উঠল চুপিচুপি, মুরগিটা খেয়ে পালক-টালক ঢিপ করে রাখল কোণে। পরের দিন ভোর-ভোর উঠল, মুখ ধুল ধবধবে করে, বাড়ির লোকেদের সুপ্রভাত জানাল, তারপর শুধোয়:

'যাঃ, আম্যর মুরগিটা কোথায়?'

'চুল্লির তলে।'

'দেখলাম, নেই সেখানে।'

বসে বসে কাঁদতে লাগল:

'থাকবার মধ্যে আমার ছিল কেবল ওই মুরগিটা, তাও চুরি গেল। মুরগির বদলে দাও কর্তা আমায় একটা পাতি হাঁস!'

কী আর করা যায়, দিতেই হল।

পাতি হাঁস নিয়ে থলের মধ্যে সেটা পুরে চলে গেল শেয়ালি।

ছুটছে শেয়ালি, ছুটছে, ফের রাত নামল রাস্তায়। দেখে একটা চাষিবাড়ি, সেখানে গিয়ে বলে:

'কুশল গো, ভালোমানুষেরা!'

'কুশল শেয়ালি দিদি।'

'রাত কাটাতে দাও এখানে!'

'কুঁড়ে আমাদের ছোটো, তোমায় শুতে দেবার জায়গা হবে না।'

'ও কিছু না! আমি ওই বেঞ্চিটার তলে গুটিশুটি ঢুকব, লেজটা টেনে নেব, রাতটুকু কেটে যাবে।'

'তাহলে বেশ, শোও।'

'আর হাঁসটা কোথায় রাখি?'

'রাখো ওকে খোঁয়াড়ে, আমাদের রাজহাঁসগুলোর সঙ্গে।'

তাই রাখল সে। আর রাতে চুপিচুপি উঠে খেয়ে নিল হাঁসটা, পালক-

টালক সরিয়ে রাখল। পরের দিন ভোর-ভোর উঠল, মুখ ধুল ধবধবে করে, বাড়ির লোকেদের সুপ্রভাত জানাল, তারপর শুধোয়:

'আমার হাঁসটা কোথায়?'

দেখা হল খোঁয়াড় — নেই। বাড়ির কর্তা বললে:

'বোধ হয় রাজহাঁসগুলোর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।'

শেয়ালি কান্না জোড়ে:

'থাকবার মধ্যে আমার ছিল কেবল ওই পাতি হাঁসটি, সেটাও গেল। দাও কর্তা, পাতি হাঁসের বদলে রাজহাঁস।'

কী আর করা যায়, দিতেই হল। রাজহাঁসটি নিয়ে, থলিতে পুরে চলে গেল শেয়ালি।

যেতে যেতে যেতে... আরে, আবার সন্ধে নামছে। দেখে, চাষিবাড়ি। সেখানে গিয়ে বলে:

'কুশল গো ভালোমানুষেরা! রাত কাটাতে দাও!'

'পারব না শেয়ালি দিদি; আমাদের এখানে বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি, তোমায় শুতে দেবার জায়গা হবে না।'

'ও কিছু না! আমি ওই বেঞ্চিটার তলে গুটিশুটি ঢুকব, লেজটা টেনে নেব, রাতটুকু কেটে যাবে।'

'তা বেশ, থাকো।'

'কিন্তু আমার রাজহাঁসটা কোথায় রাখি?'

'রাখো গে ভেড়ার ছানাদের গোয়ালে।'

তাই রাখল। আর রাতে চুপিচুপি উঠে রাজহাঁসটি খেয়ে নিয়ে পালক-টালক সরিয়ে রাখল ঢিপ করে।

পরের দিন ভোর-ভোর উঠল, মুখ ধুল ধবধবে করে, বাড়ির লোকেদের শুপ্রভাত জানাল। তারপর শুধোয়:

'আমার রাজহাঁসটি কোথায়?'

খোঁয়াড় দেখা হল — নেই। শেয়ালি বলে:

'যেখানেই-না গেছি, যেখানেই-না রাত কাটিয়েছি, এমনটা আমার কখনো হয় নি।'

বাড়ির কর্তা বললে:

'ভেড়ার বাচ্চাগুলোর পায়ের চাপে থেঁতলে গেছে হয়ত!'

শেয়ালি বলে:

'সে আমি জানি না, রাজহাঁসের বদলে দাও আমায় ভেড়ার বাচ্চা!'

তাই দিল। ভেড়ার বাচ্চাটাকে থলের মধ্যে পুরে চলে গেল শেয়ালি। ছুটছে, ছুটছে — ফের রাত নামল। দেখল একটা চাষিবাড়ি, রাত কাটাতে চাইল সেখানে:

'ভালোমানুষেরা, রাত কাটাতে দাও!'

'সেটা পারব না শেয়ালি দিদি। আমাদের এখানে বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি, শুতে দেবার জায়গা নেই।'

'ও কিছু না! আমি ওই বেঞ্চিটার তলে গুটিশুটি ঢুকব লেজটি টেনে নেব, রাতটুকু কেটে যাবে।'

'তা বেশ, থাকো।'

'কিন্তু ভেড়ার ছানাটা কোথায় রাখি।?'

'রেখে দাও আঙিনায়।'

তাই রাখল। আর রাতে চুপিচুপি উঠে খেয়ে নিল ভেড়ার ছানাটা। পরের দিন ভোর-ভোর উঠল, মুখ ধুল ধবধবে করে, বাড়ির লোকেদের সুপ্রভাত জানাল, — আর ফের সেই একই কথা:

'কোথায় আমার ভেড়ার ছানা?'

বসে বসে কাঁদে, চোখের জল ঝরায়:

'যেখানেই-না গেছি, যেখানেই-না রাত কাটিয়েছি, এমনটা আমার কখনো হয় নি!'

কর্তা বললে:

'বৌমা বুঝি বলদগুলো চরতে পাঠাবার সময় ওটাকেও ছেড়ে দিয়েছে?'

শেয়ালি কিন্তু ছাড়ে না:

'সে আমি জানি না, ভেড়ার ছানার বদলে দাও তোমার বৌমাকে।'

শ্বশুর কাঁদে, শাশুড়ি কাঁদে, কাচ্চাবাচ্চারা কাঁদে। ছেলে ওদিকে বস্তার মধ্যে কুকুর পুরে দিয়ে বললে:

'এই নে!'

শেয়ালিও কুকুর-পোরা বস্তাটা নিয়ে চলল। বস্তাটা বইছে আর গুণগুণ করছে:

'মুরগির বদলে পেলাম পাতি, পাতির বদলে রাজহাঁস পেলাম, রাজের বদলে ভেড়ার ছানা, ছানার বদলে ডাগরপানা, পেলাম বৌমা।'

অমনি কী ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল বস্তা, সেখান থেকে কুকুর:

'গর্‌র্‌র্‌...'

শেয়াল ভাবে:

'বৌমা দেখছি ভয়েই গোঁ গোঁ করছে! তা দেখি বাছা তোমায়, কেমন তুমি!'

বস্তার বাঁধন খুলে ফেলল। খোলা মাত্রই ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুর! শেয়ালি — দে-ছুট, কুকুরও তার পেছনে; শেয়ালি আগে আগে, একেবারে বনের মধ্যে, কুকুরও তার পেছন পেছন, এই ধরে-ধরে! তাহলেও শেয়ালি ছুটে যেতে পারল গর্ত অবধি, লুকিয়ে পড়ল সেখানে। কুকুর রয়ে গেল ওপরে, গর্তে আর ঢুকতে পারে না। শেয়ালি তখন শুধোয়:

'কান, আমার কানেরা, মুখপোড়া কুকুরটার কাছ থেকে যখন পালাচ্ছিলে ভাবনা-চিন্তা কী করছিলে?'

'শেয়ালি দিদি, ভাবনা-চিন্তা করছিলাম যে কুকুর যেন না ধরে, সোনালি লোম না ছেঁড়ে।'

'ধন্যি তোমরা কান। এর জন্যে সোনার মাকড়ি গড়িয়ে দেব তোমাদের।'

আবারো শুধোয়:

'পায়েরা, আমার পায়েরা, মুখপোড়া কুকুরটার কাছ থেকে যখন পালাচ্ছিলে, ভাবনা-চিন্তা কী করছিলে?'

'ভাবনা-চিন্তা করছিলাম যে কুকুর যেন না ধরে, সোনালি লোম না ছেঁড়ে।'

'ধন্যি তোমাদের পায়েরা, ধন্যি সোনামণিরা। এর জন্যে তোমাদের কিনে দেব রুপোর হিল-তোলা সোনার বুটজুতো।'

আবারো শুধোয়:

'লেজ, আমার ঝাড়ুনি, মুখপোড়া কুকুরটার কাছ থেকে যখন পালাচ্ছিলে, ভাবনা-চিন্তা কী করছিলে?'

'পায়ে বাড়ি মারছিলাম, ভাবনা-চিন্তা করছিলাম, কুকুর যেন ফেলে ধরে, সোনালি লোম ছেঁড়ে-খোঁড়ে।'

রেগে উঠল শেয়ালি, লেজ বার করে দিলে:

'বটে — তাহলে, নে কুকুর আমার লেজ, যত পারিস কামড়া!'

এমন কামড়ে ধরল কুকুর, গোটা লেজটাই খসে এল।

শেয়ালি তখন গেল খরগোশদের কাছে। তারা দেখল শেয়ালি বেঁড়ে, অমনি হাসাহাসি করতে লাগল। শেয়ালি তখন বলে:

'নাই বা থাকল লেজ, ঘুরে ঘুরে নাচ আমি তোমাদের চেয়ে ভালো পারি।'

'সে আবার কেমন নাচ?'

‘খুব সোজা! কেবল তোমাদের লেজে লেজে বাঁধতে হবে — অমনি শিখে যাবে।’

‘তা বাঁধো।’

ওদের লেজ বেঁধে দিয়ে ঢিপির ওপর লাফিয়ে উঠল শেয়ালি, উঠেই কী চিৎকার:

‘পালাও, পালাও! ধেড়ে-নেকড়ে ছুটে আসছে!’

খরগোশরা যে যেদিকে পারে ছুট লাগাতেই সবারই লেজ গেল খসে। সবাই এ-ওর দিকে চায়, কারোরই লেজ নেই।

সবাই তখন যুক্তি করতে লাগল যে-করেই হোক শেয়াল দিদির ওপর শোধ তুলতে হবে। সেটা কানে গেল শেয়ালির, বুঝল ব্যাপার সুবিধের নয়, পালানো যাক এ বনটা থেকে। বাস, দেখতে না দেখতেই সে উধাও। আর সেই থেকে খরগোশরা বিনা লেজেই দিন কাটাচ্ছে।



সেরকো

একজনের একটা কুকুর ছিল সেরকো, বুড়ো-থুত্থুরে। কুকুরটাকে সে তাড়িয়ে দিলে আঙিনা থেকে। ঘুরে বেড়ায় সে মাঠে, ভারি দুঃখু তার। 'কত বছর মালিকের কাজ করলাম, ভালো করে পাহারা দিতাম, আর এখন বুড়ো বয়সে আমায় একটুকরো রুটি দিতেও ওর কষ্ট হয়, তাড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে।' ঘুরে বেড়ায় আর এইসব ভাবে... দেখে — নেকড়ে আসছে। নেকড়ে তার কাছাকাছি এসে শুধোয়:

'ঘুরে ঘুরে বেড়াস কেন?'

সেরকো বললে:

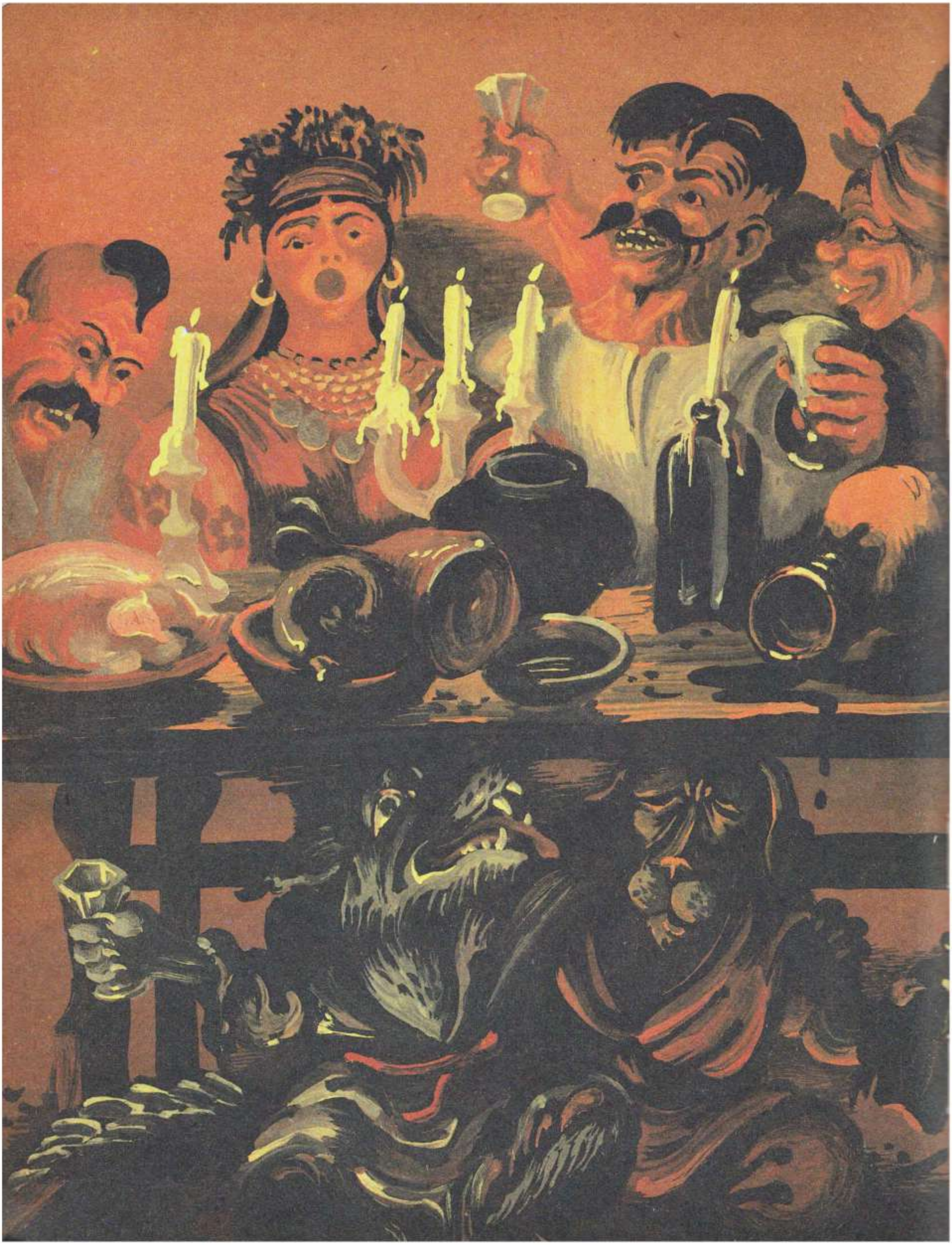
'কর্তা তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই ঘুরে বেড়াই।'

নেকড়ে বললে:

'কর্তা যাতে তোকে আবার ফেরত নেয়, তার ব্যবস্থা করব?'

সেরকোর ভারি আনন্দ হল:

'কর ভাই, কর! আমি তার শোধ দেব।'



নেকড়ে বলে:

'তাহলে শোন, কর্তা-গিন্নি যখন ফসল তুলতে যাবে, গিন্নি ছেলেটিকে রেখে যাবে গাছের তলায়, তুই সেই জায়গাটায় ঘোরাঘুরি করবি, তাতে আমি বুঝতে পারব কোথায়। ছেলেটিকে আমি তুলে নেব, তুই ছাড়িয়ে নিতে যাবি। আমি তখন যেন ভয় পেয়েছি, এই ভাব করে ছেলেটিকে ফেলে দেব।'

কর্তা-গিন্নি তো গেল ক্ষেতে ফসল তুলতে। গিন্নি ছেলেটিকে রেখে গেল ঝোপের তলে। ফসল তুলছে সে, কোনোরকম সন্দেহই করে নি। হঠাৎ কে জানে কোত্থেকে এল নেকড়ে। ছেলেটিকে মুখে নিয়ে চলল মাঠ উজিয়ে।

সেরকো ছুটে গেল নেকড়ের পেছনে, পাল্লা ধরল তার, কর্তা ওদিকে চেঁচায়:

'হুই, হুই সেরকো!'

সেরকো নেকড়ের পাল্লা ধরে ছিনিয়ে নিল ছেলেটিকে, নিয়ে এসে রাখল কর্তার সামনে। কর্তা তখন থলে থেকে রুটি আর একটুকরো চর্বি বার করে বললে:

'খা সেরকো, এটা তোর জন্যে, আমার ছেলেকে বাঁচালি বলে!'

সন্ধেয় খেত থেকে ফিরল সবাই, সেরকোকেও সঙ্গে নিলে। বাড়ি এসে কর্তা বললে:

'পুলি বানাও গিন্নি, বেশি করে, চর্বির মায়া করো না।'

রাঁধা হল পুলি। সেরকোকে খেতে বসাল কর্তা, নিজে বসল পাশে। বললে:

'পুলি দাও গিন্নি, খাওয়া যাক।'

টেবিলে পুলি রাখল গিন্নি, পুরো এক বাটি পুলি নিল কর্তা, ফুঁ দিতে লাগল যাতে সেরকোর ছ্যাঁকা না লাগে।

সেরকো তখন ভাবল, 'এমন ব্যাপার যখন, নেকড়ের উপকারের তাহলে যে করেই হোক শোধ দিতে হবে।'

তারপর হল কী, কর্তা ঠিক করল তার বড়ো মেয়ের বিয়ে দেবে। সেরকো মাঠে গেল, নেকড়ের খোঁজ করে তাকে বললে:

'রবিবার সন্ধেয় আমাদের শবজি-ভুঁইয়ে আসিস, আমি তোকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে উপকারের বদলে উপকার করব।'

এল রবিবার, সেরকো যেখানে যেতে বলেছিল, সেখানে গেল নেকড়ে। আর সেই দিনই বিয়ে হচ্ছিল। সেরকো নেকড়েকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল টেবিলের নিচে। তারপর টেবিল থেকে এক ভাঁড় ভোদ্‌কা আর সুস্বাদু একখন্ড মাংস নিয়ে দিয়ে এল নেকড়ের কাছে। নিমন্ত্রিতরা কুকুরটাকে মারতে উঠেছিল, কিন্তু কর্তা তাদের থামাল:

'মেরো না সেরকোকে! ও আমার উপকার করেছে, যতদিন বেঁচে আছি, ওর উপকার করে যাব।'

তা সেরকো টেবিল থেকে মাংসের ভালো ভালো টুকরো নিয়ে দিয়ে আসে নেকড়ের কাছে। তাকে সে এমন খাওয়াল দাওয়াল যে নেকড়ের খুব ফুর্তি হল, বললে:

'আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।'

ভয় পেয়ে গেল সেরকো।

বললে, 'নারে, গান গাইবি না, ফল হবে খারাপ। আমি তোকে বরং আরো ভোদ্‌কা দিচ্ছি, শুধু চুপ করে থাক, দোহাই তোর!'

আরো ভোদ্‌কা টেনে নেকড়ে বলে:

'এবার আমি গাইবই!'

তারপর টেবিলের তল থেকে কী তার ডাক!.. চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল অতিথিরা, কেউ এদিক ছোটে, কেউ ওদিক ছোটে, দেখে নেকড়ে।

ভয় পেয়ে কেউ পালাল, কেউ কেউ আবার নেকড়েকে মারতে যাচ্ছিল। সেরকো তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ের ওপর, যেন তার টুঁটি চেপে ধরছে। কর্তা তখন বললে:

'নেকড়েকে মেরো না, নইলে সেরকোও মারা পড়বে! নিজেই ওটাকে সে ধোলাই দেবে — হাত দিও না ওর গায়ে!'

নেকড়েকে মাঠে নিয়ে গিয়ে সেরকো বললে:

'তুই আমার উপকার করেছিলি, আমিও করলাম!'

এই বলে বিদায় নিল।

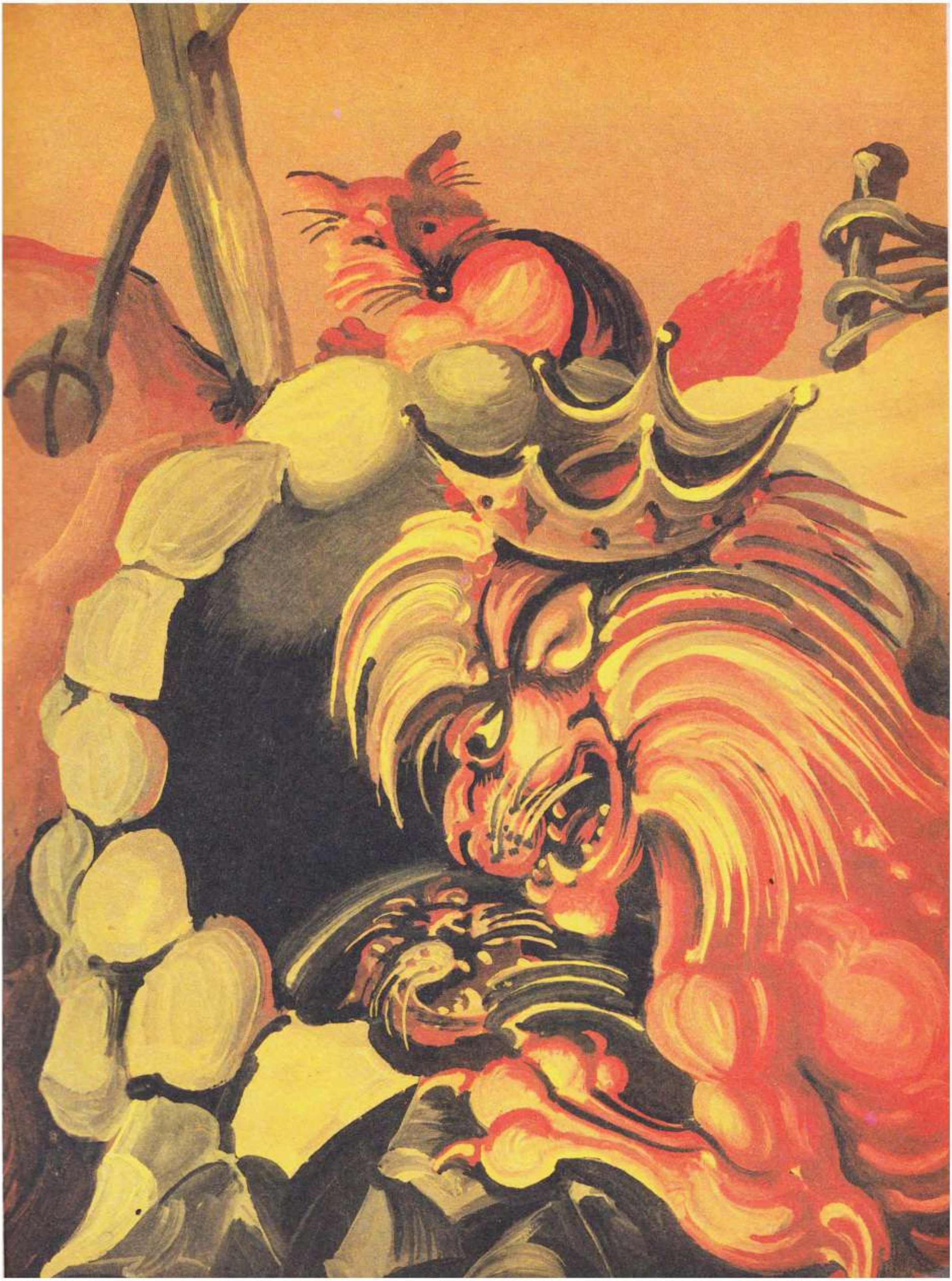


কুয়োর ভেতর সিংহ

বহুকাল আগে নিঝুম বনের মধ্যে দেখা দিল এক সিংহ, এমন সে জাঁদরেল আর ভয়ংকর যে একবার গর্জন করলেই সমস্ত জন্তু-জানোয়ার ভয়ে কাঁপত বেতস পাতার মতো। আর যখন শিকারে বেরত, সামনে যে পড়ত, তাকেই কামড়ে কুটিকুটি করত। বনশুয়োরদের পালে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে মেরে ফেলত, আর খাবার জন্যে রাখত কেবল একটাকে। ভারি ভয় পেয়ে গেল জন্তুরা, ভেবে পায় না কী করে। সবাই জুটল পরামর্শ করতে।

ভালুক তখন বললে:

'শোনো, মশাইরা, এমন দিন যায় না যে সিংহ গোটা দশেক করে জন্তু না মারে, কখনো কখনো বিশটাও। আর খায় কেবল একটা-দুটো, বাকিগুলো খামকা মরছে, কেননা রোজ সে নতুন নতুন ধরছে, আগের দিনে মারা জন্তু খায় না। তাই ওর কাছে দূত পাঠানো যাক, ওকে বোঝানো হোক...'



নেকড়ে বললে, 'যাও-না, বোঝাবার চেষ্টা করে দ্যাখো, আমাদের কথা সে কানেই তুলবে না।'

'চেষ্টা করে দেখাই যাক-না, হয়ত লেগে যেতেও পারে,' জেদ ধরল ভালুক, 'শুধু আমাদের মধ্যে কাকে পাঠানো যায়?'

'তুমিই যাও না ভালুক,' নেকড়ে বললে, 'আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বড়োসড়ো, গায়েও জোর বেশি।'

'কোথায় জোর! যতই হোক ওর সঙ্গে পারা যাবে না, আমার ওপর যদি ঝাঁপিয়েই পড়ে, তাহলে কী হবে আমার গায়ের জোর দিয়ে? বরং নেকড়ে, তুমিই যাও, আমার চেয়ে তুমি চটপটে।'

'চটপটে হলাম তো কী হয়েছে? যদি আমার পেছু ধরে, ভাবছ পালাতে পারব ওর হাত থেকে? অন্য কিছু একটা ভেবে বার করা দরকার, গায়ের জোর বা চটপটে দিয়ে কিছু হবার নয়।'

তখন হরিণ বললে:

'কী জানো মশাইরা? চাই যুতসই ধরনধারণ, এমনভাবে কথা পাড়া যাতে সিংহ না চটে যায়।'

'তা তুমি যখন এতই বুদ্ধিমান, তুমিই যাও হরিণ।'

'আরে না, আমি ও ভার নিতে পারব না। আমি শুধু বলছিলাম যে সিংহের সঙ্গে এমনি এমনি কথা কওয়া যায় না। ও তো আর আমাদের ভাই-বেরাদর নয়। উচিতমতো এগুতে হবে।'

'তাহলে কাকে পাঠানো যায়?'

'শেয়ালিকে পাঠানো হোক। ও খুব সেয়ানা, সিংহের মন জোগাতে পারবে, বোঝাবে কী ব্যাপার।'

'ঠিক বলেছ!' খুশি হয়ে উঠল জন্তুরা, 'চলন-বলন, সে শেয়ালির আছে।'

তলব করা হল শেয়ালির, ভালুক তাকে বললে:

'শেয়ালি, তোমায় সিংহের কাছে গিয়ে কথা বলতে হবে তার সঙ্গে।'

'কিন্তু আমি কী অপরাধ করলাম? অন্য কেউ যাক। কেউ যেতে রাজি না থাকলে লটারি করা হোক। যার ভাগ্যে পড়বে, সে যাবে, আপত্তি চলবে না।'

'না শেয়ালি, সেটি হবে না: যদি এমন কারো নাম ওঠে যে কথাই বলতে পারে না, কী হবে তাহলে? ভড়কে গিয়ে আজেবাজে কথা বলতে থাকবে, তাতে আরো চটে যাবে সিংহ। না শেয়ালি, আমরা তোমাকে পাঠাব ঠিক করেছি।'

মন খারাপ হয়ে গেল শেয়ালির, ভেবে পায় না কী করে। না গেলেও মরণ, গেলেও ভগবানই জানেন সে কেমন সৌভাগ্য। অনেক ভেবে ভেবে শেষে বললে:

'বেশ যাব, কপাল ঠুকে দেখি; এই আমার বরাত...'

অনেকখন বনে ঘুরে বেড়াল শেয়ালি, কেবলি ভয় পায় যেতে। কখনো এদিকে যায়, কখনো ওদিকে যায়, কেবলি ভাবে কেমন করে ঠকানো যায় সিংহকে। মরতে তার ভারি ভয়। হঠাৎ দেখতে পেল একটা কুয়ো। ঠিক করল, 'রক্তখোর সিংহের মুখে জীবন্ত পড়ার চেয়ে ডুবে মরাই বরং ভালো।'

কুয়োর কাছে গেল শেয়ালি, ঘুরে দেখল তার চারদিকে, শুঁকল, তাকাল কুয়োর মধ্যে — একেবারে গভীর জল। চেয়ে রইল সেদিকে, কুয়ো থেকেও তার দিকে চেয়ে থাকে এক শেয়ালি। প্রথমটা সে ধরতে পারে নি যে ওটা তার ছায়া। মুখ ভেংচাল সে তার জবাবে অন্য শেয়ালিও মুখ ভেংচায়। জিব দেখাল সে, ওটাও জিব দেখায়। 'আরে, দাঁড়া, দাঁড়া! এটা যে আমার ছায়া! দেখা যাক সিংহকে ঠকানো যায় কিনা; ছায়ার ব্যাপারটা যদি ওর জানা না থাকে তাহলে ওকে ঝোল খাইয়ে ছাড়ব।'

সোজা সিংহের কাছে চলল শেয়ালি। খানিকটা ফুর্তি হয়েছিল তার,

চলল তাড়াতাড়ি। রাজপ্রাসাদে গেল সে, ভয়ংকর গর্জন করে উঠল সিংহ।

নিচু হয়ে কুর্নিশ করে শেয়ালি বলে:

'হুজুর জাঁহাপনা, গর্দান নেবার আজ্ঞা দেবেন না, মুখ খোলার অনুমতি দিন। কেন এলাম সেকথা আপনাকে বলি। জন্তু-জানোয়াররা আমাদের তিনজনকে পাঠায় আপনার কাছে, দুটি খরগোশ আর আমায়, সেই সকালেই, আপনার জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে। তাড়াতাড়ি করেই আমরা আসছিলাম। কিন্তু রাস্তায় দেখা দিল কী এক জন্তু, হুজুরের মতোই দেখতে, জিগ্যেস করে, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?" আমি বললাম, "যাচ্ছি সিংহের কাছে, জন্তুরা আমাদের পাঠিয়েছে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে।" আমাদের ওপর তখন কী গর্জে উঠল জানোয়ারটা। "আরো একটা সিংহ এখানে থাকে কী করে? আমি সিংহ, সবাইকে থাকতে হবে আমার অধীনে; তোদের আমি যেতে দেব না, তোরা আমার।" কত যে আমি মিনতি করি, কত যে কাকুতি করি, "সে কী করে হয়? উনি আমাদের পথ চেয়ে আছেন, আজ ওনার জন্মদিন, এ যে ভালো দেখায় না। উনি রাগ করবেন, সমস্ত জন্তুদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন।" আর ও বলে, "ওর জন্মদিন তাতে আমার কী? ইচ্ছে হলে আমি ওকেই খেয়ে ফেলতে পারি।" কত সাধ্য-সাধনা করলাম যাতে অন্তত আমায় ছেড়ে দেয়, কোনোরকমে রাজি করালাম।'

এতই ক্ষেপে গেল সিংহ যে নিজের ক্ষিধের কথাও ভুলে গেল, ভয়ংকর গলায় শুধাল:

'বেটা থাকে কোথায়?'

'ওই ওখানে, পাথরের কেল্লায়।'

সিংহ লাফিয়ে উঠে এমন গর্জন করল যে সারা বনে তার প্রতিধ্বনি উঠল, যেন অনেক দূরে আরেকটা সিংহ গর্জাচ্ছে।

শেয়ালি তখন বললে:

'শুনছেন জাঁহাপনা, কেমন গজরাল? আপনাকে ভেংচি কাটছে।'

আরো রেগে গেল সিংহ:

'নচ্ছারটাকে আমি কুটিকুটি করব! কী আস্পর্ধা যে আমায় অমান্য করে? এটা আমার বন। চল তো জলদি, আমায় দেখিয়ে দিবি কোথায় ব্যাটা থাকে।'

শেয়াল তো সিংহকে নিয়ে গেল সেই কুয়োটার কাছে।

কুয়োর কাছে এসে সিংহ শুধোয়:

'কোথায় সে, দেখা।'

শেয়ালি বলে:

'এইখানে, এই পাথুরে কেল্লাটায়; কিন্তু কাছে যেতে ভয় করছে, খেয়ে ফেলবে আমায়। নিজেই আপনি দেখুন।'

সিংহ এগিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখল কুয়োর ভেতর, দ্যাখে কুয়ো থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে আরেকটা সিংহ। হাঁ করে দাঁত বার করল সে, অন্য সিংহও তাই করল। সিংহ তখন গর্জন করে, দূর থেকে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োয়, পড়ল একেবারে নিচে। আর কুয়োর গা পাথুরে, নখ বেঁধাবার জায়গা নেই, তাই আঁকড়ে ওঠা সম্ভব নয়, আঁকুপাঁকু করতে করতে ডুবে গেল সিংহ। না ডোবা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল শেয়ালি, ডুবতেই ছুটে গেল জন্তুদের কাছে।

এল এমন ফুর্তি করে যে জন্তু-জানোয়াররা তক্ষুনি বুঝল যে কোনো একটা সুখবর এনেছে। শুধাল:

'কী ব্যাপার, সিংহের কাছে গিয়েছিলে, নাকি মোটেই যাও নি?'

'গিয়েছিলাম, গিয়েছিলাম, তবে সে আর থাকলে তো: সিংহ ডুবে মরেছে, ঘোল খাইয়েছি।'

'কী করে ঘোল খাওয়ালে?'

যা ঘটেছিল সব বললে শেয়ালি। এতই আনন্দ হল জন্তুদের যে ধেই ধেই নাচন শুরু করল তারা। সে আনন্দ না যায় মুখে বলা, না যায় লেখা জোখা।



মরাল, চিংড়ি আর বোয়াল মাছ

তীরের কাছে ভাসছিল মরাল। ঘাড় বাঁকিয়ে সে জল দেখছিল। কাছেই ছিল একটা বোয়াল মাছ। মাছটা জিগ্যেস করলে:

'আচ্ছা বলো তো, নদী জমে গেলে তুমি কোথায় উড়ে যাও?'

'তা জেনে তোমার কী লাভ?'

'শীতকালে কোথাও পালিয়ে থাকতে চাই। নইলে জমা বরফের তলে তাজা বাতাস থাকে না, দম আটকে মরি।'

'শীতকালে আমি উড়ে যাই গরম দেশে, বসন্ত পর্যন্ত সেখানে থাকি।'

বোয়াল বললে, 'আমাকেও সেখানে নিয়ে চলো।'

'তা বেশ! যদি চাও, একসঙ্গেই উড়ে যাব। সঙ্গী থাকলে ভালোই কাটবে।'

কথাবার্তাটা কানে গেল চিংড়ির। বললে:

'আমাকেও সঙ্গে নাও।'



'তা বেশ! তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে, আনন্দে কাটবে। শরৎ পর্যন্ত এখানে থাকব, বলব কখন উড়ে যেতে হবে।'

মরাল বোধ হয় ভেবেছিল, জলে যখন ভাসে, তখন বাতাসেও ভাসতে পারবে।

গ্রীষ্ম কেটে গেল। শরৎ এল। মরালও তাই বললে:

'তা বন্ধুরা, গরম দেশে যাবার সময় এসে গেছে। তৈরি হয়ে নাও, কাল খাওয়া-দাওয়ার পর রওনা দেব।'

বোয়াল সেকথা বললে চিংড়িকে। চিংড়ি অনেক ভেবে ভেবে শেষে বললে:

'মাটির ওপর বোন থাকব কেমন করে? কী খাব? পথের জন্যে খাবার নেওয়া যাক, শেষ পর্যন্ত যাতে চলে।'

'কিসে করে তা নেব?' জিগ্যেস করলে বোয়াল।

'একটা ঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে নিজেরা জুতব। মরালকেও ডাকব, টেনে নিয়ে যাব তিনজনে।

গাড়ি একটা জোগাড় করল মাছ আর চিংড়ি, ঘাস দিয়ে লাগাম বুনল, অপেক্ষা করতে লাগল মরালের, পরের দিন মরাল এসে বলল:

'তোমরা তৈরি তো সব? নইলে আমি কিন্তু উড়ে যাব।'

'তৈরি, তৈরি! কেবল গাড়িটা টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করো-না, তিনজনে কাঁধ লাগিয়ে রওনা দেব।'

'ঠিক আছে, আমার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দাও।'

মরালের পা বেঁধে দিল চিংড়ি, নিজের লাগামটা ধরল দাঁড়া দিয়ে। তিন নম্বর লাগামটা বোয়াল কামড়ে ধরল দাঁতে।

'তাহলে এবার সবাই — চললাম।'

অমনি টান পড়ল তিন দিকে। চিংড়ি পিছিয়ে গেল, তাই তার হাঁটার

ধরন। বোয়াল সোজা জলের দিকে। আর মরাল ডানা মেলে একেবারে আকাশে। সবকটা লাগামই গেল ছিঁড়ে আর গাড়িটা রয়ে গেল একই জায়গায়। ওদের মধ্যে কে ঠিক, কার ভুল, কেউ তা জানল না। তা নিয়ে মাথাও ঘামাল না কেউ। কেবল কোলা ব্যাঙদের সে কী হাসি, কী হাসি! সবচেয়ে তাদের অবাক লেগেছিল এই দেখে, যার যা সাজে না, তা করতে গেল কেন বোয়াল আর চিংড়ি?

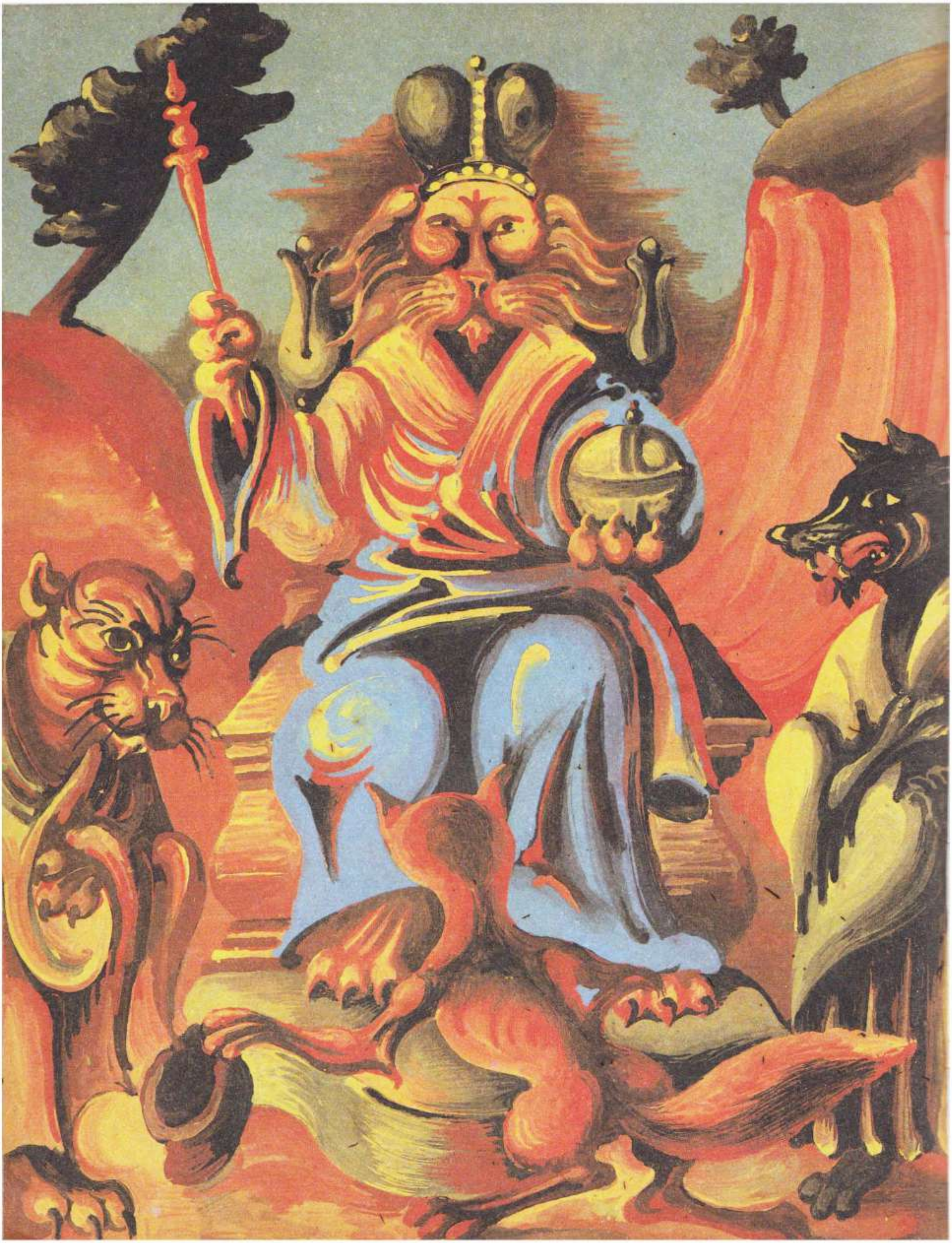


সিংহের রাজত্ব

বনের পশুরা একদিন জুটে পরামর্শ করতে লাগল কাকে রাজা করা যায়, সবাই যাকে কেবল ভয়ই করবে না, ন্যায্য বিচারক বলে মান্যও করবে। কিন্তু রাজা ঠিক করা গেল না — জমায়েতে সবাই আসে নি: সবচেয়ে বড়োসড়ো বলবান জন্তুরাই হাজির ছিল না। তখন ঠিক হল আবার সবাইকে ডাকা হবে — ছোটো থেকে বড়ো পর্যন্ত সবাইকে, যাতে ব্যাপারটা চুকে যায়।

সব জন্তুই এল সেদিন। ছিল: হাতি, সিংহ, বাঘ, জলহস্তী, গণ্ডার, ভালুক, নেকড়ে, হরিণ, উট, শেয়াল, খরগোশ, বনশুয়োর, জেব্রা, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গরু, কুকুর, বেড়াল, মেরু-বেড়াল, ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, যতরকম জন্তু ছিল দুনিয়ায়; বলতে-কি গাধাও বাদ যায় নি।

সবাই যখন জুটল, প্রথম কথা বলতে শুরু করল হরিণ:



'আমরা যে চুনোপুঁটি জন্তুরা আপনাদের, বড়ো বড়ো বলবান জন্তুদের ডেকেছি, তার জন্যে হোমরাচোমরা মহাশয়রা, আমাদের ওপর রাগ করবেন না। আমরা ঠিক করেছি আপনাদের মধ্যে থেকে কাউকে সমস্ত জন্তুদের ওপর রাজা করব।'

তখন হাতি বললে:

'এটা বেশ ভালো কথা। ন্যায্য ব্যবস্থা আর আইনকানুন চালু করার সময় হয়ে গেছে অনেকদিন। একজন রাজা ঠিক করা দরকার, সে আমাদের সবাইকে চালাবে, লুটপাট হতে দেবে না, ন্যায় মতে বিচার করবে। ভালো করে ভেবেচিন্তে বলুন কাকে রাজা করতে চান। আমিই অবিশ্যি রাজা হতে পারি, সবার চেয়ে আমি বড়োসড়ো, সবার চেয়ে বলবান। পছন্দ না হয়, সে আপনাদের ইচ্ছে। আমার কিছু এসে যায় না।'

কোনোরকম অনুমতি-টনুমতির ধার না ধেরে সিংহ এগিয়ে গেল সামনে:

'না মশাইরা, না! হাতির কোনো রকমেই রাজা হওয়া চলে না। দ্যাখো না, কিরকম জবরজং, থুমসো, জোরে ছুটতে পারে না। রাজা হওয়া আমাকেই মানায়। সবাই আমার কথা শুনবে, আমায় মানবে। আমি চটপটে, দেখতে সুন্দর, বলবান।'

তখন ছুটে এল শেয়াল, গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে শুরু করল:

'আমরা জানি যে রাজা হওয়া দু'জনেরই সাজে। তবে কারো যাতে দুঃখু না থাকে, ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ছাড়াই ব্যাপারটা চুকে যায়, তাই গোপনে পরামর্শ করা যাক, তোমাদের মধ্যে কে রাজা হবে। তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে পরামর্শ করব আমরা।'

শেয়ালের কথা ভালো লাগল সবার, জন্তুরা চিৎকার করল, 'সাধু, সাধু!'

ঠিক করল দেরি না করে কাজে লাগা যাক। সবাই দূরে চলে গিয়ে তর্ক বাধাল। সবচেয়ে অসহায় আর দুর্বল জন্তুরা চেঁচাতে লাগল:

'হাতির রাজা হওয়া উচিত। দুনিয়ার সমস্ত জন্তুর মধ্যে সেই বেশি বুদ্ধিমান, সবচেয়ে ন্যায্য মতে সে চলবে।'

আর বেশি বলবান, চটপটে জন্তুরা চ্যাঁচাল:

'রাজা হওয়া উচিত সিংহের। সে শুধু হাতির চেয়ে বেশি চটপটে তাই নয়, দেখতেও সুন্দর। কেবল সেই রাজা হতে পারে!'

অনেকে লটারি করার কথা পাড়ল।

শেয়াল ভয় পাচ্ছিল সিংহকে, শেয়ালকে সে বলেছিল তার পক্ষ নিতে, ভয়ও দেখিয়েছিল, তাকে রাজা করা না হলে সে তাকে কুটিকুটি করবে। প্রাণের ভয়ে সে সিংহকে রাজা করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। সবাই যাতে তাকে দেখতে পায়, তার জন্যে গাছের গুঁড়ির ওপর উঠে শুরু করল:

'মশাইরা, শোনো আমি যা বলি। অনেকে রাজা করতে চায় হাতিকে। তা সত্যি — হাতি বুদ্ধিমান, গায়ে জোর আছে, রক্ত ভালোবাসে না, অন্যকেও মাংস খেতে দেবে না। কিন্তু নিজেরাই বিচার করে দ্যাখো: এমন ও জবুথবু, কেমন রাজা হবে সে? আমাদের শত্রুরা এখনকার চেয়েও বেশি করে ক্ষতি করবে আমাদের, লুটপাট করবে। কেউ ওকে স্রেফ ভয়ই পাবে না। ওরা বেশ জানে যে শাস্তি দিতে ও পারবে না, কারো পেছু ধাওয়া করলে, তারা পালাবে। আমি মনে করি সিংহকে রাজা করাই ভালো। সে বুদ্ধিমান, বলবান, তড়িঘড়ি, দোষীদের সে শাস্তি দিতে পারবে, সবাই ভয় পাবে ওকে। কেউ অন্যায় করলে ওর কাছ থেকে পালাতে পারবে না। যাকে খুশি, দৌড়ে হারিয়ে দেবে সবাইকে।'

হরিণ বললে, 'এ সবই ঠিক, কিন্তু ন্যায় কাজ করবে কি? অধিকাংশ যা বলবে, তাই হোক। এসো লটারি করা যাক, কারো নালিশ থাকবে না।'

'এটা ন্যায্য কথা!' চেঁচাল জন্তুরা।

'কিন্তু লটারি করব কেমন করে?'

হরিণ বললে, 'এই করা যাক, যারা সিংহকে রাজা চায়, তারা গাছের কোটরে একটা ক'রে বাদাম ফেলবে। আর যারা হাতিকে চায়, তারা ফেলবে ওক-ফল।'

'বেশ বুদ্ধি করেছ,' বলল সবাই, 'তাই করি।'

ওক-ফল আর বাদাম জড়ো করে ঢিপ করা হল। শেয়াল তার পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল:

'তাহলে মশাইরা, এবার কাজ শুরু করা যাক।'

সবাই পালা করে ওক-ফল আর বাদামের ডাঁইয়ের কাছে যেতে থাকল। যার যা পছন্দ, প্রত্যেকেই তা নিয়ে ফেলতে লাগল গাছের কোটরে। হিংস্র জন্তুরা রক্তের ভক্ত। তারা নিতে লাগল বাদাম, যারা ঘাস-পাতা খেয়ে থাকে, তারা নিল ওক-ফল। সিংহের ভাগে কম পড়ছে দেখে লেজ নাড়তে থাকল শেয়াল। জন্তুদের কাছে ছুটোছুটি করে সে চোখ মটকাতে লাগল যেন বলতে চায় 'বাদাম নাও!' আর ছোটো ছোটো জন্তুরা যখন আসতে লাগল ডাঁইয়ের কাছে, সে তাদের কানে কানে ফিস ফিস করতে শুরু করল, 'বাদাম নাও, নইলে সিংহ রেগে যাবে, চিঁড়ে-চ্যাপটা করবে তোমায়, আমিও রেগে যাব, থাকার জায়গা দেব না।' সিংহের কুনজরে পড়ার ভয় পেল ছোটো ছোটো জন্তুরা, বাদামের ঢিপে সারি দিল তারা। আর শেয়াল যে ওদিকে একটা বাদামের বদলে পুরো একমুঠো তুলে কোটরে ফেলেছিল, সেটা কেউ খেয়ালই করে নি।

ওক-ফল আর বাদাম যখন গোনা হল, দেখা গেল দুই-ই সমান সমান। ভালুক তখন বললে:

'তাহলে কী করা যায় এখন? এ যেন কেমন-কেমন ঠেকছে। আবার ফেলা

যাক, তবে ভালো করে নজর রাখতে হবে কেউ যেন যা উচিত তার বেশি না নেয় আর কোনটা নিতে হবে, কেউ যেন তা নিয়ে ফুসফাস না করে।'

শেয়াল ফের সামনে গিয়ে বললে:

'না মশাইরা, দ্বিতীয় বার লটারি করা চলে না। বরং এই করা যাক: হাতি আর সিংহের কাছে গিয়ে বলি যে তারা দু'জনেই আমাদের কাছে সমান। কে আমাদের রাজা হবে সেটা আমরা পরে ঠিক করব, ওদের বলব ওদের কী করতে হবে।'

সবাই গেল সিংহ আর হাতির কাছে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাতে।

এবারেও শেয়াল সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে:

'মশাইরা, লোকেরা আপনাদের, সিংহ মশাই আর হাতি মশাইয়ের মধ্যে একজনকে রাজা করবে বলে ঠিক করেছে। কে তা হবে, তা ঠিক করার জন্যে আমরা ওক-ফল আর বাদাম ফেলি। গুণে দেখা গেল, তোমাদের দু'জনের অধিকারই সমান। এখন অন্য একটা উপায় ভাবা যাক। আমি বলি কি, দৌড়ে যে অন্যকে হারাতে পারবে, সেই রাজা। এখুনি, দেখা হোক। যে জোরে ছোটে, সে রাজা।'

হাতি বললে:

'জোরে ছুটতে আমি পারি না, জন্ম থেকেই আমি ওইরকম। তাছাড়া আমার মনে হয়, রাজার পক্ষে ছোটারও দরকার করে না। দরকার শৃঙ্খলা, সুবুদ্ধি, ন্যায় বিচার। কারো পেছনে যদি ছুটতে হয়, আমি হুকুম দেব, অন্য কেউ ছুটবে।'

'বেশ, তাহলে এই হোক: যে আপনাদের মধ্যে বেশি উঁচুতে লাফ দিতে পারবে, সেই রাজা।'

হাতি আপত্তি করল:

'না, লাফাতে আমি পারি না, আমি তো আর হালকা-পলকা নই।'

'তাহলে সিংহই রাজা হোক!' যারা সিংহের পক্ষে, চেঁচিয়ে উঠল তারা সবাই।

হাতি তখন বলে:

'আমার অবশ্য কিছুতেই এসে যায় না, তবে এটা অন্যায়। সিংহ যা করতে পারে, আমি তা পারি না, আর আমি যা পারি, সিংহ তা পারে না। তাই যখন ব্যাপার, তখন সিংহ লড়ুক আমার সঙ্গে। সে যদি আমায় হারায়, তাহলে সে রাজা হবে।'

শেয়াল রাজি হল, কিন্তু পরে আরো একটা মতলব ঠিক করে বললে:

'বেশ, আপনার কথাই রইল: লড়বেন! কিন্তু এখন দেরি হয়ে গেছে, হাঁপিয়ে পড়েছি আমরা, খিদে পেয়েছে, কাল সকালে খাবার পর সেটা হোক। শুধু তোমরা মশাইরা, আগেভাগে লড়াই দেখতে এসো না, ওঁদের লজ্জা হবে, বাধা হবে। আমরা পরে এসে দেখব কে কাকে হারিয়েছে।'

সবাই রাজি হল। রাত নামল, ঘুম পেল হাতির, বনে গেল সে; তেমন মোটা নয়, এমন একটা ওক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। হাতিরা সাধারণত ঘুমোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছে ঠেস দিয়ে। কাত হয়ে শুলে নিজে নিজে আর উঠতে পারে না। দূর থেকে হাতির ওপর নজর রেখেছিল শেয়াল, যেই দেখল হাতি অঘোরে ঘুমচ্ছে, সিংহের কাছে ছুটে গিয়ে বললে:

'হুজুর জাঁহাপনা, চলুন তাড়াতাড়ি। হাতি ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজে লাগা যাক।'

সিংহ শুধাল, 'কী করব আমরা? হাতিকে পিষে ফেলা আমার সাধ্যে কুলাবে না। জেগে উঠবে, হারিয়ে দিতে আমি পারব না।'

'আজ্ঞে না, ওকে পিষে ফেলার দরকার নেই। ঘুমোবার সময় ও গাছে

ঠেস দিয়ে থাকে। গাছটা আমরা কামড়ে ভেঙে ফেলব। গাছও পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে হাতিও পড়ে যাবে। আমরা বলব যে তুমি হাতিকে হারিয়ে দিয়েছ।'

'বেশ বুদ্ধি করেছ, তবে একলা আমি সকালের মধ্যে গাছ কামড়ে কামড়ে ভেঙে ফেলতে পারব না — দাঁত ব্যথা করবে, তুমি বরং কাউকে সাহায্যে ডাকো।'

শেয়াল ছুটে গিয়ে কয়েক গণ্ডা নেকড়েকে নিয়ে এল হাতির কাছে। ওক গাছ কামড়াতে থাকল তারা। কামড়াতে কামড়াতে একেবারে ভোর হয়-হয়। তখনো কাজ কম বাকি নেই। গাছ টলছে, কিন্তু পড়ে নি। কী করা যায়? ফরসা হয়ে এসেছে, হাতি জেগে উঠতে পারে, গাছ কিন্তু পড়তে চাইছে না। এবারও একটা ফন্দি বার করল শেয়াল। তিন ভালুককে ডেকে বললে:

'আমাদের ভাবী রাজা হাতি এই ওকগাছে মধু পেয়েছে। যখন সে ঘুমতে যায়, আমায় বলে গেছে তোমাদের ডাকতে, ওর জন্যে তোমরা যেন মধু জোগাড় করে রাখো। মধু চাই হাতি জেগে ওঠার আগেই, নইলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।'

মধুর খোঁজ পেলে ভালুকদের তো আনন্দ হবেই। তিনজনেই উঠল গাছে। শেয়াল ওপর দিকে চেয়ে তাদের চুপিচুপি বলে:

'ওইখানে ওঠো,' গাছটা যেদিকে হেলে পড়েছে, সেই দিকে দেখাল একটা কাকের বাসা, কালচে-কালচে। ভালুকেরা উঠল একেবারে আগডালে, সে ভার সইতে পারল না ওকগাছ। মটমট করে ভেঙে পড়ল। হাতিও উলটে পড়ল চিৎপাত হয়ে। নিজে নিজে আর উঠতে পারে না। ভালুকগুলোও গাছ থেকে ধপাস করে যেই-না পড়া, অমনি অক্কা।

সকালের খাবার দাবার খেয়ে জন্তুরা এসে জুটতে থাকল। ধরাশায়ী

হাতির ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সিংহ, আর দূরে লেজ নাড়াচ্ছে শেয়াল। সমস্ত জন্তু যখন জমায়েত হল, শেয়াল বললে:

'দ্যাখো মশাইরা, কী বলবান আমাদের রাজা, হাতিকে হারিয়েছে। হাতি পড়ে যাবার সময় ওকগাছটা ধরতে গিয়েছিল, সিংহ ওই ওকগাছের সঙ্গেই হাতিকে করেছে কুপোকাৎ। ওক যতই শক্ত হোক, পারল না, ভেঙে গেল। আর তিনটে ভালুক হাতির পক্ষ নিয়ে লড়তে এসেছিল, কিন্তু সিংহ তাদের এইসা ছুড়ে ফেলে দেয় যে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গেছে। ওই দ্যাখো, পড়ে আছে বেচারারা।'

অনেকেই ভয়ে থরহরি, সবাই একবাক্যিতে চেঁচিয়ে উঠল:

'সিংহই আমাদের রাজা হোক!'

সেই থেকে সব জন্তুই থাকে সিংহের ভয়ে ভয়ে, রাজা বলে তাকে মানে। সিংহ গর্জন করে উঠলেই বনের সব জন্তু কেঁপে ওঠে।

রাজা সিংহ বহাল করল তার কয়েকজন লাট। নেকড়ে পেল ঘেসো মাঠের, বাঘ বনের, আর শেয়াল খেতের ভার।

লাটেরা রাজাকে সেলাম ঠুকে গেল নিজের নিজের জায়গায়। অন্যান্য জন্তুরা বলাবলি করতে লাগল:

'নেকড়ে আর শেয়াল কী এমন করেছে যে অমন মান্যি? ওদের চাইতে ভালো জন্তু তো আছে, অথচ লাট হল না।'

হরিণ তখন বললে:

'হ্যাঁ মশাইরা, ব্যাপারটা তেমন সুবিধের নয়। ন্যায্য মতে, সৎ পথে চলে রাজার মন পাওয়া যায় না। আমি তক্ষুনি বুঝেছিলাম সিংহ অত সহজে হাতিকে হারাতে পারে নি। কোনো একটা চালাকি ছিল তাতে। শেয়াল তো চালাকিতে ওস্তাদ, কিছু একটা ফন্দি করেছিল সে। নেকড়েরাও নিশ্চয় সাহায্য করেছিল, তাই তাদের এত কদর। কিন্তু বাঘ — এটা অন্য ব্যাপার।

বাঘ বলবান জন্তু, কর্তা হওয়া তার সাজে। তাছাড়া ওকে বাদ দিয়ে চলবে না — সিংহের ওপর ক্ষেপে উঠতে পারে, সব বানচাল করে দেবে তখন। শক্তিতে সে তো সিংহের চেয়ে তেমন খাটো নয়।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছিল,' বলে উঠল ভালুক, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওরা চালাকি করেছে। হাতিকে বোকা বানিয়েছে, আমার তিন ভাইও মারা পড়ল। বেশ বুঝতে পারছি যে ওকগাছটা কামড়ে কামড়ে নড়বড়ে করেছিল ওই নেকড়েগুলোই...'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!' সায় দিয়ে উঠল বাকি সবাই।

এমন সময় দেখে, শেয়াল যাচ্ছে কাছ দিয়ে। চুপচাপ হয়ে গেল সবাই।

'স্-স্-স্! চুপ। শুনতে পাবে। কানে গেলে বিপদ। পাঠাবে কোথায় কোন যমদুয়োরে।'

শেয়াল থেমে গেল, জিগ্যেস করে:

'সবাই দেখছি জুটেছ, ঘোঁট পাকাচ্ছ বুঝি?'

'কী যে বলো! কালকের ব্যাপারটা নিয়ে কথা কইছিলাম। ভারি আমাদের আনন্দ যে অমন রাজা পেয়েছি, লাটরাও কেমন বুদ্ধিমান, সাধুসজ্জন।'

'বটে! তা মন্দ নয়। তবে জমায়েত-টমায়েত আর নয়। ওসবের আইন আর নেই।'

এর পর জন্তুরা যে যার নিজের মতো থাকতে লাগল। যারা ঘাস পাতা, শাকশবজি খেত, তারা রইল শান্তি মেনে, হৈ-হাঙ্গামা না করে, আর হিংস্র জন্তুরা লুটপাট করে বেড়াতে লাগল, দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত, কিন্তু তারা যে রাজা বা আইনের কাছে অন্যায় কিছু করে নি, তা দেখাবার জন্যে বোঝাত যে তারা সবকিছুই করছে তাদের চাকরির খাতিরে, নিজের ইচ্ছেয় নয়। রাজা মাঝে মাঝে শুধাত, 'খরগোশটাকে মারলে কেন?' জবাব হত, আজ্ঞে, রাজাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল, রাজাকে খুন করার উশকানি

দিচ্ছিল বলে। লাটদের কথা বিশ্বাস করত রাজা, ভালো কাজের জন্যে পুরস্কার দেওয়া হত তাদের।

খেতের লাটগিরিতে বিরক্তি ধরে গেল শেয়ালের। ছোটোখাটো নেংটি ইঁদুর-টিঁদুর ছাড়া আর কিছু সেখানে মিলত না। আর সে চায় মুরগি-টুরগি, হাঁস-টাঁস। রাজার কাছে গিয়ে সে বললে:

'হুজুর জাঁহাপনা, মুরগিদের দেখাশোনা করা, শত্রুদের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর ভার আমায় দিন।'

'মুরগি আবার কেন?' জিগ্যেস করলে রাজা, 'কী সেখানে এমন বেবন্দোবস্ত?'

'মেরু-বেড়াল আর ধেড়ে ইঁদুরেরা কোনো দয়ামায়া না করে মুরগি আর ছানাদের মারছে। মোরগ আমার কাছে নালিশ করেছে, আপনাকে বলতে বলেছে, নইলে, নইলে সবাই টিটকারি দেবে যে আইন-শৃঙ্খলা আপনি রাখতে পারেন না।'

সিংহ ভাব দেখাল যেন শেয়ালের কথা সে বিশ্বাস করেছে, তাকে বহাল করল মুরগি-খোঁয়ারের জিম্মাদার। শেয়ালের আনন্দ আর ধরে না। ছুটে গেল গ্রামে। রাত নামতেই তদারক করতে লাগল মুরগি ঘরগুলোর, আর তদারকের মধ্যেই রোজ মুরগি খেতে শুরু করল দুটো-তিনটে করে।

তারপরে তো মানুষ একদিন পাহারায় ছিল, মুরগি খামারে খপ করে শেয়ালের লেজ চেপে ধরে — দে মার! এমন মার মারল যে শেয়াল মরো-মরো। পাছে সে বেঁচে উঠে পালায়, তার জন্যে তার লেজে দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে রাখল বেড়ার খুঁটিতে। মানুষ ঘুমতে গেলে শেয়ালের জ্ঞান ফিরল, ভাবতে লাগল কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। ছটফট করে, ঝাঁকি দেয়, কিন্তু ছিঁড়তে আর পারে না, দড়িটা ছিল ভারি শক্ত। তখন ঠিক করল লেজটাকেই

বাদ দেওয়া যাক. বেঁচে তো থাকবে! যন্ত্রণা হচ্ছিল বটে, তাহলেও নিজের লেজ কামড়াতে লাগল শেয়াল। কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল, বাস পালিয়ে গেল।

মাঠ দিয়ে শেয়াল লাফাতে লাফাতে যায় আর ভাবে: কী করা যায়? আমার অধীনদের কাছে মুখ দেখাই কেমন করে? ওরা আমায় কেয়ার করবে না, কথা শুনবে না। রাজার কাছেই বা মুখ দেখাই কী করে? কী বলব যদি লেজের কথা জিগ্যেস করে? লাটের কিনা লেজ নেই সে যে লজ্জার কথা! বরং আমায় সে খুন করলেই পারত, সেই ভালো হত। যাক, লজ্জার কথা, তা বটে, তাহলেও বেঁচে তো থাকা দরকার। যাই খরগোশের ডেরায়, ঘা না সারা পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে থাকব।

খরগোশের ডেরায় গিয়ে টোকা দেয়:

'ঢুকতে দে, রাতটা কাটাই এখানে। উপকার করব তোর।'

খরগোশ বলে, 'না, তা হবে না। ছোটো ছোটো ছেলেপুলে আমার, বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি।'

'বলছি তোকে দরজা খোল! জানিস কে আমি? আমি খেতের লাট, পোষা মুরগিদের জিম্মাদার। গাঁয়ে গিয়েছিলাম রাজার কাজে।'

ভয় পেয়ে গেল খরগোশ, দরজা খুলে দিলে। শেয়াল ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল নরম বিছানায়, ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাচ্চাগুলোকে।

বাচ্চাদের জন্যে খাবার আনতে গেল খরগোশ, ওদিকে খিদে পেয়েছিল শেয়ালের। একটা বাচ্চা ধরে খেয়ে নিল।

নিজের ছানাপোনাদের খাওয়াতে এল খরগোশ, দেখে একটা ছানা নেই। জিগ্যেস করলে:

'হুজুর, আমার বাচ্চাটা কোথায়? একটাকে যে দেখছি না।'

'কী আস্পর্ধা তোর, আমায় জিগ্যেস করিস তোর বাচ্চার খবর! কে

আমি, তোর ছেলের আয়া? তুই ওদের বিইয়েছিস, আর আমায় ক্ষণে ক্ষণে বসে গুণতে হবে সব ঠিক আছে কিনা। প্রাণে যদি বাঁচতে চাস, মুখ সামলে চলবি, নইলে একেবারে আস্তো গিয়ে পড়বি রাজার থাবার তলে।'

ডেরা থেকে বেরুল খরগোশ, কাঁদলে, তারপর ফের গেল বাচ্চাদের খাবার আনতে। বাড়ি ফিরল — আরো একটা খরগোশছানা নেই। কিছুই বলতে গেল না খরগোশ, বাকিগুলোকে খাইয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

কাছ দিয়ে যাচ্ছিল আরেকটা খরগোশ, আত্মীয় দেখে থামল, শুধোল:

'কাঁদছ কেন ভাই?'

'না কেঁদে উপায় কী। আমার ঘরে ঢুকেছে শেয়াল, আমাকে কোণঠাসা করে রেখেছে, খাচ্ছে ছানাগুলোকে, আমি টুঁ শব্দটি করারও সাহস পাচ্ছি না। তার ওপর শাসায়: "রাজাকে বলে দেব, তোকেই খেয়ে ফেলবে।" '

'তুমি ভাই, নালিশ করো রাজার কাছে।'

'আমাদের মতো জীবেদের পাত্তা কোথায় সেখানে: তাছাড়া, রাজাও তো অমনি। দরবারের লোকেরা নালিশ তুলতেই দেবে না — কেউ কি আর নিজেদের সাঙাতকে ডোবাতে চায়?'

কথাবার্তা কয়ে খরগোশ চলে গেল।

দুঃখী খরগোশ ঘরে ফিরল, চারিদিকে চেয়ে দেখে একটা বাচ্চাও নেই। ভেতরে ঢোকার সাহস হল না খরগোশের। বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করল। কাছ দিয়ে যাচ্ছিল ছেয়ে-ধেবড়ে নেকড়ে। খরগোশকে দেখে থামল, শুধোয়:

'খরগোশ, কাঁদছ কেন?'

'না কেঁদে কী করি। শেয়াল আমার বাড়িতে সেঁধিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে আমার সবকটি বাচ্চাকে, এবার আমার পালা। ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি।'

'দুঃখু করো না খরগোশ, দাঁড়াও, ওকে ভাগিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ির কাছে এল ওরা। দরজায় ধাক্কা দিয়ে নেকড়ে বলে:

'কে রে তুই? বেরিয়ে আয় বলছি!'

'আমি শেয়াল। আমার ওপর গলা চড়ায় কার এমন সাহস?'

'আরে, তুই শেয়াল,' বললে ছেয়ে-ধেবড়ে নেকড়ে, 'দুবলা অভাগা প্রাণীদের কষ্ট দেওয়া লজ্জার কথা ভায়া। বেরিয়ে এসো, অনুরোধ করছি!'

'আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না নেকড়ে। নিজের এলাকার সুব্যবস্থা করো গে, আমি আমারটা দেখব।'

নেকড়ে দেখে কোনো ফল হচ্ছে না, রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল শেয়ালের নামে। তক্ষুনি আদালতে হাজির হবার হুকুম দিয়ে সিংহ হরিণকে পাঠাল শেয়ালের কাছে। শেয়াল আসতেই সিংহ ভয়ংকর গর্জে উঠল:

'এসব কী বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছিস তুই?'

শেয়াল হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নুইয়ে বললে:

'হুজুর জাঁহাপনা, শাস্তি দেবেন না, দুটো কথা বলার হুকুম দিন।'

'তা বল।'

'জাঁহাপনা, আমি জানি যে নেকড়ে আমার নামে নালিশ করেছে। কিন্তু সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তাহলে সমস্ত দোষ নেকড়েরই। আমি নই, সে-ই খেয়েছে খরগোশের বাচ্চাগুলোকে। আমি খরগোশের পক্ষে

দাঁড়িয়েছিলাম, ও আমার লেজ কামড়ে নিয়েছে, একেবারেই আমায় মেরে ফেলতে গিয়েছিল, কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। আজ্ঞা করুন দেখাই কী আমার হেনস্থা করেছে সে — লেজ কামড়ে ছিঁড়েছে — এর বাড়া অপমান আর কী হতে পারে। তার ওপর, দেখুন, সমস্ত দোষ চাপিয়েছে আমার ঘাড়ে।'

অনেক ভেবে ভেবে শেষে সিংহ বলল:

'তা, তুই অবিশ্যি ঠিকই বলেছিস, তবে লাট থাকা তোর আর চলবে না। থাকবি আমার এখানে, প্রাসাদের পাহারাদারদের সর্দার হয়ে, আর নেকড়েকে আমি শাস্তি দেব।'

নেকড়েকে তলব করে পাঠাল সিংহ। আর নিজে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে থাকল। কে ঠিক, কে দোষী বলা কঠিন। সম্ভবত, দু'জনেই মিথ্যে কথা বলছে। শুধু ওদের মধ্যে কে বেঁচে থাকবে, সেটা ভেবে দেখতে হয়। শেয়াল বড়ো সেয়ানা, খুব সম্ভব, ছয়লাপটা ওরই কীর্তি। তবে ওকে শাস্তি দেওয়া কিছুতেই চলে না। সেই তো ফন্দিফিকির করে সিংহাসনে বসিয়েছে সিংহকে। আর নেকড়ে? সে অবিশ্যি গাছ কামড়াতে সাহায্য করেছে, তবে সে আর এমন কী — কামড়াতে যেকোনো হাঁদাই পারে। নেকড়েকেই শাস্তি দিতে হয়। দু'জনের একজনকে মরতেই হবে।

নেকড়েকে নিয়ে আসা হল রাজার কাছে। সিংহ কোনো কথাও বললে না, স্রেফ এক থাবায় মেরে ফেলল নেকড়েকে। সে খবর পেয়ে নেকড়েরা পরামর্শ করতে লাগল: কী করা যায়, কেমন করে প্রতিশোধ নেওয়া যায় শেয়ালদের ওপর, খোদ রাজার ওপরেও? এমন ঝগড়াঝাঁটি বেধে উঠল যে বলার নয়। পালে পালে নেকড়েরা হামলা করতে লাগল শেয়ালদের ডেরায়, ছারখার করতে লাগল সবকিছু, মারতে লাগল কচি, বুড়ো সমস্ত শেয়ালকে।

এ লড়াই কতদিন চলত বলা যায় না, কিন্তু লোকেদের বিরক্তি ধরে গেল যে কেবলি খোয়া যাচ্ছে কখনো মুরগিটা, কখনো ভেড়াটা, কখনো বাছুর, হিংস্র জন্তুদের ঘেরাও করল তারা। সিংহকে ধরে বন্ধ করা হল খাঁচায়, মারা পড়ল অনেক নেকড়ে, বাকি জন্তুরা পালাল যে যেদিকে পারে। শান্ত হয়ে এল দেশটা।



তেলেস্‌িক

এক-যে ছিল ব্‌ড়ো আর ব্‌ড়ি। ব্‌ড়ো হল কিন্তু ছেলেপ্‌লে নেই। কষ্ট হয়, দ্‌ঃখ্‌ করে, 'ব্‌ড়ো বয়সে কে আমাদের দেখবে? মরণকালে কে আমাদের পাশে থাকবে?' ব্‌ড়োকে ব্‌ড়ি বলে:

'বনে যাও গো, আমার জন্যে একটা কাঠের পায়া আর একটা দোলনা বানিয়ে দাও; পায়াটাকে দোলনায় রেখে দোলাব। অন্তত খানিক মন-ভুলানি তো হবে।'

ব্‌ড়ো প্রথমটা গা করে নি, ব্‌ড়ি কিন্তু কেবলি মিনতি করে; শেষ পর্যন্ত ব্‌ড়ো শ্‌নল তার কথা, বনে গেল। কাঠের একটা পায়া চেঁছে তুলল, দোলনা বানাল। ব্‌ড়ি পায়াটাকে দোলনায় রেখে দোলায় আর গ্‌নগ্‌ন করে:



তেলেসিক, যাদু আমার,
রেঁধেছি তোর জইয়ের মাড়,
রেঁধেছি তুলতুলে খাবার,
তেলেসিক, যাদু আমার!

দোলাতে, দোলাতে, শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে উঠে দেখে, পায়াটা হয়ে গেছে ছোট্ট একটি ছেলে! ভারি আনন্দ হল তাদের, ছেলের নাম রাখল তেলেসিক।

দিনে দিনে বাড়ে ছেলেটি, ভারি শান্তশিষ্ট — বুড়োবুড়ির আনন্দ আর ধরে না।

যখন হল নওল কিশোর, ছেলে বললে:

'বাবা আমায় সোনার নাও, রুপোর বৈঠা বানিয়ে দাও-না: নদীতে মাছ ধরব, তোমাদের খাওয়াব।'

বুড়ো বানাল সোনার নাও, রুপোর বৈঠা। নৌকো ভাসল নদীতে। তেলেসিক চলে গেল। নদীতে নাও ছাড়ে, মাছ ধরে, বুড়োবুড়িদের খাওয়ায়। মাছ ধরা হলে তা দিয়ে যায়, ফের নাও ভাসায়। বুড়ি তার জন্যে খাবার নিয়ে আসে, প্রতিবার বোঝায়:

'দেখিস বাছা, যখন আমি ডাক দেব, নাও ভেড়াবি, অন্য কেউ ডাকলে নাও বেয়ে চলে যাবি।'

একদিন বুড়ি দুপুরের খাবার রেঁধে তীরে এসে ডাকল:

তেলেসিক, সোনা আমার
রেঁধেছি তোর জইয়ের মাড়,
নৌকো ভেড়া নদীর পাড়!

তেলেসিক শুনতে পেল।

'যা নৌকো ভেসে, তীরের দিকে, তীরের দিকে! মা আমার দুপুরের খাবার রেঁধে এনেছে।'

ভেসে এল। নাও ভেড়াল তীরে, খেল, দেল, রুপোলি বৈঠা নেড়ে ভেসে গেল নদীতে, আরো মাছ ধরতে।

ওদিকে নাগিনীর কানে গিয়েছিল মা কেমন করে তেলেসিককে ডাকে। নদীর তীরে এসে সে হেঁড়ে গলায় গর্জে উঠল:

তেলেসিক, সোনা আমার
রেঁধেছি তোর জইয়ের মাড়,
নৌকো ভেড়া নদীর পাড়!

ছেলে কান পেতে শোনে...

'না, এ তো আমার মায়ের গলা নয়! ভেসে যা নাও, ভেসে যা নাও দূরে! ভেসে যা নাও, ভেসে যা নাও দূরে!'

বৈঠা টানল, নৌকোও চলতে থাকল। নাগিনী দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত চলে গেল, কোনো ফল হল না।

তেলেসিকের মা এবার রাঁধল বিকেলের খাবার, তীরে এনে ডাকে:

তেলেসিক, সোনা আমার,
রেঁধেছি তোর জইয়ের মাড়,
নৌকো ভেড়া নদীর পাড়!

শুনতে পেল তেলেসিক।

'যা নৌকো ভেসে, তীরের দিকে, তীরের দিকে! মা আমার বিকেলের খাওয়া রেঁধে এনেছে।'

তীরে এল, খেল, দেল, মাকে মাছগুলো দিলে, নৌকো ভাসিয়ে ফের চলে গেল।

নাগিনী আবার এসে ফের ডাকে হেঁড়ে গলায়:

তেলেসিক, সোনা আমার,
রেঁধেছি তোর জইয়ের মাড়,
নৌকো ভেড়া নদীর পাড়!

ছেলে টের পেল এটা মায়ের গলা নয়, বৈঠা বাইতে লাগল।

'ভেসে যা নাও, ভেসে যা নাও দূরে! ভেসে যা নাও, ভেসে যা নাও দূরে!'

নৌকোও দূরে ভেসে গেল।

নাগিনী দেখে, কোনো ফল হচ্ছে না। গেল কামারের কাছে:

'কামার, ও কামার! আমার গলা পিটিয়ে মিহি করে দাও, তেলেসিকের মায়ের মতো।'

তাই পিটিয়ে দিলে কামার। তীরে গিয়ে নাগিনী ডাকতে লাগল:

তেলেসিক, সোনা আমার
রেঁধেছি তোর জইয়ের মাড়,
নৌকো ভেড়া নদীর পাড়!

ছেলে ভাবল মা ডাকছে।

'যা নৌকো ভেসে, তীরের দিকে, তীরের দিকে। মা আমার জন্যে খাবার এনেছে।'

তীরে এসে ভিড়ল। নাগিনীও অমনি তাকে নাও থেকে টেনে বার করে নিয়ে যেতে লাগল নিজের বাড়ির দিকে।

নিয়েই এল:

'নাগ-খুকি আলেঙকা, দরজা খোল!'

আলেঙকা দরজা খুলল, নাগিনী ঢুকল ভেতরে।

'নাগ-খুকি আলেঙকা, গনগনে করে চুল্লি ধরা, তেলেসিককে ভাজবি। আমি চললাম লোকেদের খেতে ডাকতে — ফুর্তি করব।'

উড়ে গেল নেমন্তন্ন করতে।

গনগনে করে চুল্লি জ্বালাল আলেঙকা, বলে:

'উঠে বস এই বেলচার ওপর।'

'আমি তো জানি না। কেমন করে বসতে হয়?'

'আরে বস শিগগির!' চিৎকার করে আলেঙকা।

বেলচার ওপর হাত রাখল সে। জিগ্যেস করে:

'এমনি করে?'

'আরে না, পুরোপুরি উঠে বস।'

মাথা রাখল সে:

'তাহলে এমনি করে?'

'আরে না, না! উঠে বস পুরোপুরি।'

'কিন্তু কেমন করে? বোধ হয় এইভাবে?' পা রাখল সে।

বলে, 'আরে না, আরে না! অমন করে নয়!'

তেলেসিক বলে, 'তাহলে দেখাও কেমন করে। আমি যে জানি না!'

দেখাতে গেল আলেঙকা। আর যেই-না বসা, অমনি বেলচা সমেত

আলেঙ্কাকে ঢুকিয়ে দিল তন্দুরের ভেতরে, ঢাকনা বন্ধ করে দিল তার, নিজে বাড়ির দরজায় কুলুপ দিয়ে উঠে বসে রইল আঙিনার উঁচুমতো ডুমুর গাছটায়।

নিমন্ত্রিতদের নিয়ে উড়ে এল নাগিনী:

'আলেঙ্কা খুকি, দোর খোল!'

কোনো সাড়া নেই।

'আলেঙ্কা খুকি, দরজা খোলরে!'

কেউ সাড়া দিলে না।

'হতচ্ছাড়া আলেঙ্কা, গেল কোথায়?'

নিজেই দরজা খুলল নাগিনী, নিমন্ত্রিতদের ভেতরে ডাকল, সবাই বসল খাবার টেবিলে। তন্দুরের ঢাকনা খুলে রোস্ট বার করে আনল নাগিনী। সবাই খায়, ভাবে তেলেসিকের মাংস খাচ্ছে।

ভরপেট খেয়ে বেরিয়ে এল আঙিনায়, দাও এবার ঘাসে গড়াগড়ি।

'গড়াগড়ি দাও, লুটোপুটি খাও, তেলেসিকের মাংস খেয়েছি!'

আর গাছ থেকে তেলেসিক বলে:

'গড়াগড়ি দাও, লুটোপুটি খাও, আলেঙ্কার মাংস খেয়েছ!'

ওদের কানে গেল — সে আবার কী? তবু ফের বলে:

'গড়াগড়ি দাও, লুটোপুটি খাও, তেলেসিকের মাংস খেয়েছি!'

তেলেসিকের সেই একই কথা:

'গড়াগড়ি দাও, লুটোপুটি খাও, আলেঙ্কার মাংস খেয়েছ!'

অবাক মানল সবাই — এ আবার কী?

শুরু করল এদিক-ওদিক খোঁজা, এদিক-ওদিক দেখা। দেখে ডুমুর গাছে তেলেসিক। ছুটে গিয়ে ডুমুর গাছ কামড়াতে লাগল সবাই। কামড়াতে কামড়াতে দাঁতই গেল ভেঙে। ছুটে গেল কামারের কাছে:

'কামার, ও কামার, এমন দাঁত আমাদের বানিয়ে দাও যাতে গাছটাকে কামড়ে ভেঙে ফেলতে পারি।'

কামারও তাই বানিয়ে দিলে। ফের তারা তাদের কাজে লাগল, কামড়ে কামড়ে গাছ এই পড়ে-পড়ে...

এইসময় এক ঝাঁক হাঁস উড়ে আসছিল। তেলেসিক তাদের মিনতি করলে:

হাঁস, ওগো হাঁস, হাঁসুলি,
নাও আমাকে দোদুলি!
কী যেন হয় আমার পাছে,
বাড়িতে পথ চেয়ে আছে,
নামিয়ে দিও দোরের কাছে!

হাঁসেরা প্যাঁকপাঁক করে উঠল:

'আমরা প্রথম ঝাঁক। তোমায় নিক মাঝের ঝাঁকটা।'

নাগেরা ওদিকে কামড়াচ্ছে তো কামড়াচ্ছেই। এল আরো একটা ঝাঁক। তেলেসিক মিনতি করলে:

হাঁস, ওগো হাঁস, হাঁসুলি,
নাও আমাকে দোদুলি!
কী যেন হয় আমার পাছে,
বাড়িতে পথ চেয়ে আছে,
নামিয়ে দিও দোরের কাছে!

কিন্তু এরাও বললে:

'আমরা মাঝখানের ঝাঁক! তোমায় নিক শেষের ঝাঁকটা।'

ডুমুরগাছ ওদিকে মটমট করছে। নাগিনীরা একটু করে জিরোয়, আবার কামড়াতে শুরু করে, জিরোয় আর কামড়ায়... আরো এক ঝাঁক উড়ে আসছে। তেলেসিক মিনতি করে:

হাঁস, ওগো হাঁস, হাঁসুলি,
নাও আমাকে দোদুলি!
কী যেন হয় আমার পাছে,
বাড়িতে পথ চেয়ে আছে,
নামিয়ে দিও দোরের কাছে!

আর ওরা বললে:

'শেষ হাঁস তোমায় নিয়ে যাক!' এই বলে উড়ে গেল।

বসে আছে তেলেসিক, বসে আছে, আহারে দুলাল — গাছ এই ভেঙে পড়ল বলে, তখন সব শেষ! দেখে, আকাশে উড়ছে একটা হাঁস, শুধু একটি। বোঝা যায় দলছুট — কোনোরকমে উড়ছে। তেলেসিক তাকে বললে:

হাঁস, ওগো হাঁস, হাঁসের পো,
আমায় নিয়ে চলো গো,
সবাই আছে পথ চেয়ে,
দরদি তুমি সবার চেয়ে,
নইলে নাগে ফেলবে খেয়ে!

হাঁস বললে:

'তা বসো।'

পিঠে বসাল তাকে, তবে বোঝা যায়, খুবই নেতিয়ে পড়েছিল। একেবারে নিচু দিয়ে ওড়ে। নাগিনীও তাদের পেছনে। এই ধরে-ধরে... না, যতই হোক ধরতে আর পারল না।

কোনোরকমে হাঁস উড়ে এসে তেলেসিককে নামিয়ে দিলে বাড়ির দেয়াল ঘেরা রোয়াকের ওপর, আর নিজে চরে বেড়াতে লাগল আঙিনায়।

তেলেসিক সেখানে বসে বসে শোনে কী হচ্ছে বাড়ির ভেতর। বুড়ি সেখানে পিঠে ভেজেছে, তন্দুর থেকে পিঠে বার করে বলছে:

'এই নাও গো তোমার পিঠে, আর এটা আমার জন্যে।'

ওদিকে বাইরে থেকে তেলেসিক বলে:

'আর আমার জন্যে?'

বুড়ি ফের পিঠে বার করল:

'এ পিঠেটা তুমি খাও গো, এটা আমার জন্যে।'

তেলেসিক ফের বলে:

'আর আমার জন্যে?'

কানে গেল তাদের। কী ব্যাপার?

'শুনছ গো, কে যেন বাইরে কী বলছে?'

বুড়ো বলে, 'বোধ হয় তোমার কানের ভুল।'

বুড়ি আবার বলে:

'এটা তুমি খাবে গো, এটা আমি।'

'আর আমার জন্যে?' রোয়াক থেকে বলে তেলেসিক।

'ওই দ্যাখো, এখনো কে যেন কথা কইছে!' এই বলে বুড়ি গেল জানলার কাছে। দেখে অলিন্দে তেলেসিক।

অমনি বেরিয়ে এল বুড়ি, তেলেসিককে ধরে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতর, কী যে তার আনন্দ!..

হাঁস ওদিকে আঙিনায় ঘুরঘুর করছে। বুড়ির চোখে পড়ল:

‘সুন্দর কী একটা হাঁস চরছে। যাই, ধরে আনি গে, ভাজা যাবে।’

তেলেসিক বললে:

‘না মা, ওকে কেটো না, খেতে দাও ওকে। ও না থাকলে তোমাদের এখানে আমার আসাই হত না।’

খাওয়ানো হল, দাওয়ানো হল, চালার নিচে ছড়িয়ে দেওয়া হল গম। উড়ে গেল হাঁস।

আমার কথাটি ফুরলো, একসার পিঠে জুড়লো।

মায়া ডিম

অনেকদিন আগে, কেউ জানে না কবে, ভরত পাখি ছিল রাজা, আর মূষিকা ছিল রানী। নিজেদের মাঠ ছিল তাদের। গম বুনল তাতে। গম ফলার পর দানা ভাগাভাগি করতে লাগল। কেবল একটা দানা রয়ে গেল বাড়তি। মূষিকা বললে:

'ওটা আমিই নিই!'

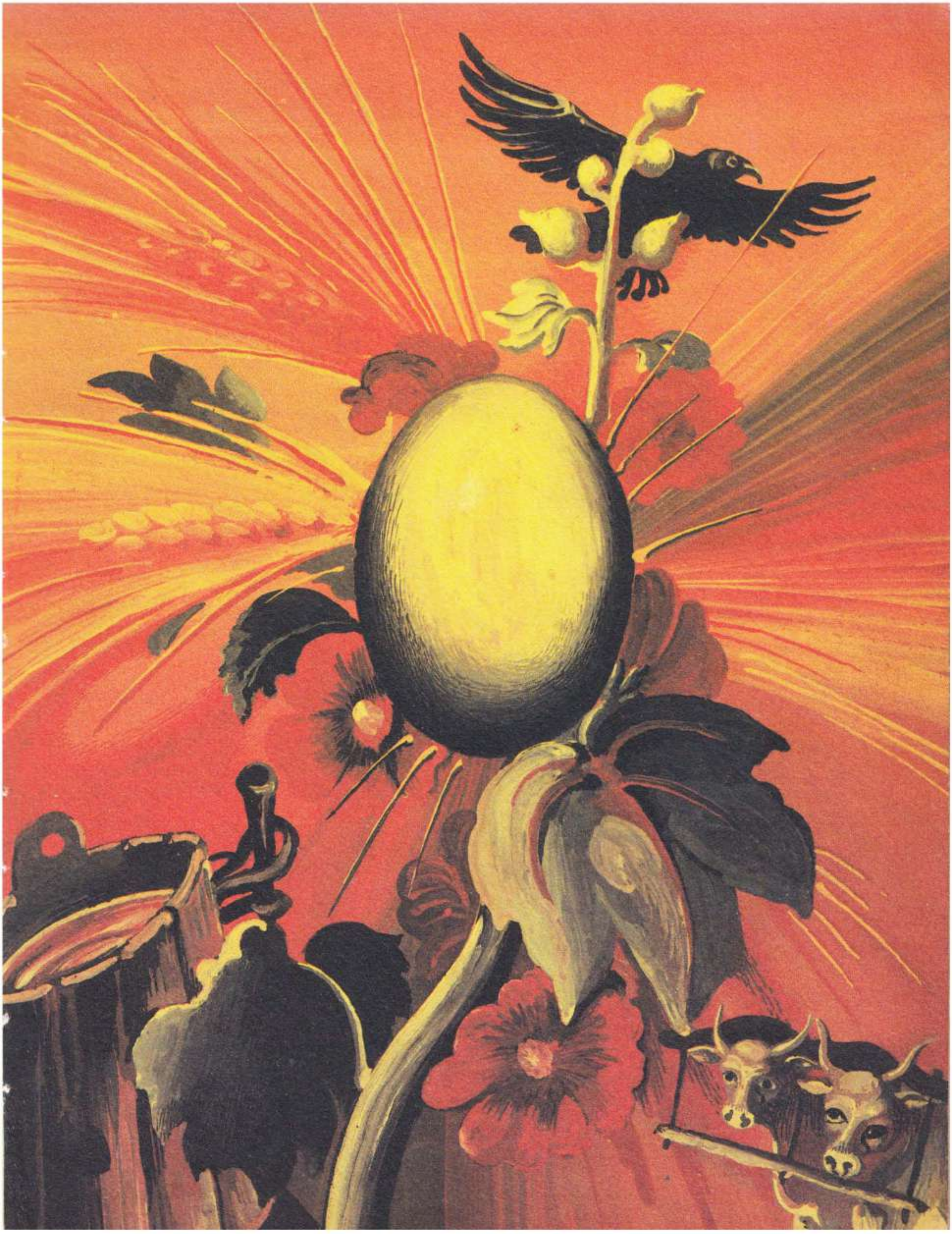
কিন্তু ভরত বলে:

'না, ওটা আমার।'

'বেশ, আধাআধি চেরা যাক।'

ভরত পাখি রাজি হল। ভাঙার জন্যে দানায় কামড় দিয়েই-না মূষিকা সেটা মুখে করে পালাল গর্তে। ভরত পাখি তখন জিগির দিলে, মূষিকা রানীর সঙ্গে লড়াইয়ে জড়ো করল বনের সব পাখি, রানী জড়ো করল সব পশুদের, যুদ্ধ বাধল।

লড়াই চলল সারা দিন, সন্ধেয় জিরিয়ে নেবার জন্যে থামল সবাই।



মূষিকা রানী তাকিয়ে দেখে, ডাঁশেরা লড়াইয়ে আসে নি। তখন হুকুম করল তাদের আসতে। ঝাঁক বেঁধে উড়ে এল ডাঁশেরা। মূষিকা হুকুম দিলে রাতে পাখিদের পাখার পালক যেন কামড়ে কামড়ে খসিয়ে দেয়।

পরের দিন ভোর হতেই রানী চেঁচিয়ে উঠল:

'ওঠো সবাই, লড়াই!'

পাখিরা উঠতে গেল, কিন্তু উড়তে আর পারে না, পড়ে যায় মাটিতে জন্তুরা তাদের কামড়ে খায়। জয় হল রানীর।

তবে একটা ঈগল পাখি দেখে ব্যাপার সুবিধের নয়, বসেই থাকে গাছে, ওড়ে না। এই সময় এল শিকারী। দেখে গাছে বসে আছে ঈগল, অমনি তাক করল তার দিকে! আর ঈগল কাকুতিমিনতি করে:

'মেরো না আমায়, জোয়ান শিকারী, আমি তোমার খুব কাজে লাগব।'

আরেকবার তাক করল শিকারী, ঈগল ফের মিনতি করে:

'নিয়ে চলো আমায়, সেবাশুশ্রূষা করো, দেখবে তখন কেমন তোমার কাজে লাগি।'

আরো একবার তাক করল শিকারী, ঈগলও মিনতি করতে লাগল:

'না, না, আমায় মেরো না, ভারি কাজে লাগব তোমার!'

তার কথায় বিশ্বাস হল শিকারীর। গাছে উঠে তাকে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরল। ঈগল তাকে বললে:

'তুমি আমায় মাংস খাইয়ে যাও যতদিন না পাখায় আমার জোর পাচ্ছি।'

ওদিকে শিকারীর তো ছিল দুটি গরু আর একটি ষাঁড়। একটা গরু সে কাটল। সারা বছর ধরে ঈগল খেল সেটাকে। ঈগল বললে:

'ছেড়ে দাও আমায়, উড়ে দেখি পাখা আমার গজাল কিনা।'

তা শিকারী তাকে ছেড়ে দিলে। ওড়ে ঈগল, কেবলি ওড়ে, দুপুরে ফিরল বাড়িতে। বললে:

'এখনো জোর আমার কম! অন্য গরুটাও কাটো!'

শিকারী তার কথামতো দ্বিতীয় গরুটাও জবাই করল। এক বছর ধরে ঈগল খেল সেটা। তা খাবার পর ফের উড়ে গেল। উড়ে চলল প্রায় গোটা দিন, ফিরল সন্ধেয়, বললে:

'এবার ষাঁড়টাকে কাটো।'

শিকারী ভাবে, 'কী করা যায়? কাটব নাকি কাটব না?' তারপর বললে:

'সবই গেল, তা এটাও যাক!'

জবাই করল ষাঁড়টাকে। এক বছর ধরে ঈগল খেল সেটা, তারপর কী ওড়াই না উড়ল! ওই উঁচুতে, উঁচুতে, একেবারে মেঘের নিচে। যখন ফিরল শিকারীকে বললে:

'ধন্যি তোমায় ভালোমানুষের পো। যত্ন আত্তি করেছ আমার। এবার আমার পিঠে চেপে বসো।'

শিকারী শুধোয়:

'কেন?'

ঈগল বলে:

'বলছি বসো!'

শিকারীও বসল।

ঈগল তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নীল মেঘের ওপারে, তারপর নিচে ফেলে দিল। ঈগল উড়ছিল, পড়ন্ত অবস্থায় ধরে ফেলল শিকারীকে, বললে:

'তা কিরকম লাগল?'

শিকারী বললে:

'প্রায় মরো-মরো।'

ঈগল বললে:

'তুমি যখন তাক করেছিলে আমারও তেমনি লেগেছিল।' পরে বললে, 'আবার উঠে বসো।'

ঈগল ফের তাকে নীল মেঘের ওপারে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল মাটিতে, ফের তাকে ধরে ফেলল প্রায় মাটিতে পড়বার মুখে। জিগ্যেস করলে:

'তা কেমন লাগল?'

শিকারী বললে:

'মনে হচ্ছিল আমার হাড়গোড় সব খসে পড়েছে।'

ঈগল তখন বলল:

'আমারও তাই মনে হয়েছিল যখন আরেক বার তুমি তাক করেছিলে। নাও বসো আরেক বার।'

শিকারী বসল।

ঈগল তাকে আরেক বার নিয়ে গেল নীল মেঘের ওপারে। নিচে ফেলে দিয়ে ধরল তাকে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়ার মুখে। ধরে ফেলে তারপর শুধোয়:

'তা কেমন লাগল?'

'মনে হচ্ছিল আমি যেন আর বেঁচে নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল যখন তিন বারের বার তাক করেছিলে আমায়।' তারপর বললে, 'এবার আমাদের শোধবোধ হয়ে গেল। ওঠো আমার পিঠে, উড়ে যাব বাড়িতে, আমার রাজ্যে।'

উড়ছে তারা, উড়ছে, উড়ে উড়ে পেঁছিল ঈগলের কাকার কাছে। ঈগল বললে:

'বাড়ির ভেতরে যাও, যখন জিগ্যেস করবে, "আমাদের ভাইপোকে দেখেছ?" বলবে, "মায়া ডিম দিলেই তাকে এনে দেব।"'

শিকারী ঢুকল বাড়ির ভেতর; ওরা তাকে শুধাল:

'নিজের ইচ্ছায় এলে নাকি অনিচ্ছায় এলে?'

ও বললে:

'সুজন কসাক সর্বদাই নিজের ইচ্ছেয় চলে।'

ওরা শুধাল:

'আমাদের ভাইপোকে দেখেছ কোথাও? তিন বছর হল যুদ্ধে গিয়েছিল, আজ অবধি তার কোনো খবর নেই, পাত্তা নেই।'

শিকারী বললে:

'মায়া ডিম দাও, এক্ষুনি ওকে এনে দিচ্ছি।'

ওরা বললে:

'তোমায় মায়া ডিম দেবার চেয়ে কখনো ওর দেখা না পাওয়াও বরং ভালো।'

তখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঈগলকে বললে:

'ওরা জবাব দিল, "মায়া ডিম দেবার চেয়ে কখনো ওর দেখা না পাওয়াও বরং ভালো।"'

ঈগল বললে:

'আরো ওড়া যাক।'

উড়ছে ওরা, উড়ছে, উড়ে উড়ে এল ভাইয়ের কাছে। সেখানেও একই ব্যাপার, যা ঘটেছিল কাকার বাড়িতে: মায়া ডিম শিকারী পেল না। তখন তারা উড়ে গেল ঈগলের বাবার কাছে। শিকারীকে ঈগল বললে:

'বাড়ির ভেতর যাও, আমার সম্পর্কে যেই জিগ্যেস করবে, ব'লো: "মায়া ডিম দাও, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"'

ভেতরে ঢুকল শিকারী, তাকে জিগ্যেস করলে:

'ইচ্ছায় এলে, নাকি অনিচ্ছায় এলে?'

সে জবাব দিল:

'সুজন কসাক সর্বদাই নিজের ইচ্ছেয় চলে।'

ফের তারা শুধায়:

'আমাদের ছেলেটাকে দেখেছ? যুদ্ধে গিয়েছিল, চার বছর কেটে গেল। মারা পড়ল নাকি?'

শিকারী বললে:

'মায়া ডিম দাও, এক্ষুনি ওকে এনে দিচ্ছি।'

ঈগলের বাপ তখন বললে:

'ডিম দিয়ে তোমার কী হবে? তোমায় বরং টাকা দেব অনেক।'

শিকারী কিন্তু বলে:

'টাকা আমার চাই না। মায়া ডিম দাও!'

'বেশ, মায়া ডিম তোমায় দিচ্ছি, কেবল তাড়াতাড়ি ছেলেকে এনে দাও।'

তা শিকারী তো ঈগলকে নিয়ে এল বাড়িতে। সবার ভারি আনন্দ, শিকারীকে মায়া ডিম দিয়ে বললে:

'পথে ভেঙো না কিন্তু। বাড়ি গিয়ে চারিদিকে মস্তো বেড়া তুলে তারপর ভেঙো।'

বাড়ি চলল শিকারী। যেতে, যেতে, যেতে, বড়ো তেষ্টা পেল। পাওয়া গেল একটা কুয়ো, জল খেতে যাচ্ছে, অমনি বালতিতে লেগে ভেঙে গেল ডিমটা। আর ডিম থেকে সে কী বেরিয়ে আসতে থাকল গরুর পাল। বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। পালকে তাড়া দেয় শিকারী, এদিক থেকে তাড়া দেয়, ওদিক থেকে তাড়া দেয়, কিছুই হয় না: গোটা পাল ছুটে পালায়। চেঁচায় বেচারি, সামলাতে পারে না কিছুতেই। দেখে, এক নাগিনী আসছে।

'পালটাকে যদি ডিমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, কী আমায় দেবে?'

শিকারী বললে:

‘কী তুমি চাও?’

নাগিনী বললে:

‘তুমি না থাকতে বাড়িতে নতুন যা এসেছে, সেটা আমায় দেবে?’

ও বলল:

‘দেব।’

নাগিনী গরুর পাল তাড়িয়ে ডিমের ভেতর ঢুকিয়ে, ভালো করে খোলা বন্ধ করে দিল তার হাতে।

বাড়ি এল শিকারী, এদিকে সে বাড়ি না থাকার সময় ছেলে হয়েছে তার। মাথায় হাত দিল শিকারী:

‘আমি যে ছেলে তোকে দিয়ে রেখেছি নাগিনীর কাছে!’

দুঃখ করল শিকারী আর তার বৌ, তারপর ঠিক করলে:

‘কী আর করা যাবে! চোখের জলে তো কোনো সুরাহা হবে না, বেঁচে থাকতে হবে কোনোরকমে।’

মস্তো বেড়া তুললে সে, ডিমটা ভাঙল, ছেড়ে দিল গরুর পাল, — বড়োলোক হয়ে গেল তারা।

দিন কেটে যায়... বড়ো হয়ে উঠল ছেলে। একদিন সে বললে:

‘বাবা, তুমি আমায় নাগিনীকে দিয়ে দিয়েছ। যাব তার কাছে, যা হবার হোক।’

গেল সে নাগিনীর কাছে। সে আসতে, নাগিনী তাকে বললে:

‘আমার তিনটে কাজ করে দিলে তোকে বাড়ি যেতে দেব। না করলে খেয়ে ফেলব।’

নাগিনীর বাড়ির কাছে ছিল প্রকাণ্ড এক মাঠ, তার শেষ দেখা যায় না। নাগিনী বললে:

‘এই মাঠ তুই এক রাত্তিরের মধ্যে পরিষ্কার করে, খুঁড়ে, গম বুনবি;

ফসল তুলে, গাদি দিবি... আর এক রাত্তিরের মধ্যেই সে গম থেকে আমার জন্যে রুটি বানাবি। ঘুম থেকে যখন উঠব, টেবিলে যেন রুটি তৈরি থাকে।'

চলল নওল কিশোর, মাথা নুয়ে পড়েছে। কাছেই একটা থাম, ইঁট গেঁথে তার মধ্যে থাকত নাগিনী কন্যে। থামের কাছে গিয়ে সে তাতে ঠেস দিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। তাতে কন্যে তাকে শুধায়:

'কাঁদছ কেন?'

ছেলে বলে:

'না কেঁদে উপায় কী! নাগিনী আমায় যা করতে বলেছে, সারা জীবনেও তা আমি করে উঠতে পারব না, এক রাত্তিরে তো দূরের কথা।'

কন্যে আবার শুধায়:

'কী করতে বলেছে তোমায়?'

তা সব কথা সে জানাল। কন্যে তখন বললে:

'আমায় বিয়ে করবে? সব সময়মতো করে দেব।'

ছেলে বললে:

'করব।'

কন্যে তখন বললে:

'এখন ঘুমোও, কাল সকাল সকাল উঠে রুটি নিয়ে যেও।'

কন্যে বেরিয়ে এল সেই প্রকাণ্ড মাঠে, কী তার শিস! মটমট করে সব ভাঙে, ঘট ঘট করে শব্দ হয় — নিজে থেকেই হাল পড়ে মাঠে, নিজে থেকেই গম বোনা হয়ে যায়। ভোর হবার আগেই কন্যে বানিয়ে ফেলল পুরুষ্টু রুটি, দিল সেটা কুমারকে, সেও তা নিয়ে গেল নাগিনীর বাড়ি, রাখল টেবিলের ওপর।

ঘুম ভাঙল নাগিনীর, বাইরে বেরিয়ে এসে অবাক মানে: মাঠে ফসল গাদি করা। তখন সে ছেলেকে বললে:

'তা করতে পেরেছ বটে। তবে দেখো, আরেকটা কাজও যেন হয়।' এই বলে সে হুকুম দিলে, 'এই পাহাড়টা খোঁড়ো, এখান দিয়ে যেন ব'য়ে যায় নিপার নদী। আর নদীর পাড়ে বানাবে গমের গোলা: জাহাজগুলো যেন ভেড়ে এখানে, সব গম বিক্রি করে দেবে তাদের। আমি সকালে উঠব, সব যেন তৈরি থাকে।'

ফের গেল সে থামের কাছে, হাহাকার করে কাঁদে। নাগিনী কন্যে ফের তাকে শুধায়:

'কাঁদছ কেন?'

নাগিনী যা হুকুম করেছে, সব সে বললে তাকে।

কন্যে কিন্তু বললে:

'ঘুমতে যাও, সব ঠিকঠাক হবে।'

আর কী তার শিস! দুখান হয়ে গেল পাহাড়, তার ভেতর দিয়ে বইল নিপার নদী, তীরে তৈরি হচ্ছে গমের গোলা... তখন কন্যে এল তাকে জাগিয়ে দিতে, জাহাজ থেকে যে সদাগররা নামছে, তাদের কাছে যাতে সে গম বেচতে পারে।

ঘুম ভাঙলে, অবাক মানে নাগিনী, যা যা বলেছিল, ঠিক সে সবই ঘটেছে।

তখন তিন বারের বার তাকে ধাঁধায় ফেলল সে:

'এই রাতের মধ্যেই সোনার খরগোশ ধরে সাত সকালে নিয়ে আসবি আমার বাড়িতে।'

ফের সে গেল সেই থামের কাছে, কেঁদে বুক ভাসায়। নাগিনী কন্যে জিগ্যেস করলে তাকে:

'কী হুকুম করেছে?'

'সোনার খরগোশ ধরতে বলেছে।'

কন্যে তখন বললে:

'নাহ্, এটা তেমন ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কে জানে সোনার খরগোশ কোথায়. কী করে ধরতে হবে। তা কী করা যাবে, চলো যাই ওই পাহাড়টায়।'

তাই গেল। কন্যে বললে:

'তুমি ওই গর্তটার মুখে দাঁড়াও। তুমি ধরবে, আমি তাড়া দেব। তবে দেখো: যাই বেরুক, তাকেই ধরবে — সেই-ই হল সোনার খরগোশ!'

গেল সে তাড়া দিতে। এদিকে গর্ত থেকে বেরল তক্ষক, ফোঁস ফোঁস করছে, তাকে সে ছেড়ে দিল। কন্যে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে শুধাল:

'কী, কেউ বেরয় নি?'

'ও কিছু না, বেরিয়েছিল এক তক্ষক, ভয় লাগল, দিলাম ছেড়ে।'

কন্যে তখন বললে:

'ধুৎ, কী লোক তুমি! ওটাই যে সোনার খরগোশ। শোনো, আমি আবার যাচ্ছি। কেউ যখন বেরিয়ে এসে বলবে, ওখানে সোনার খরগোশ নেই. বিশ্বাস করো না, ধরবে তাকে।'

ভেতরে ঢুকল কন্যে, তাড়া দেয় সেখান থেকে। বেরিয়ে এল এমন থুত্থুরে এক বুড়ি যে বলবার নয়। ছেলেকে সে জিগ্যেস করল:

'এখানে বাছা দাঁড়িয়ে আছ কিসের জন্যে?'

ছেলে বলে:

'সোনার খরগোশের জন্যে।'

বুড়ি বললে:

'সোনার খরগোশ এখানে থাকবে কোত্থেকে? খামোকাই দাঁড়িয়ে আছ।'

এই বলেই পালিয়ে গেল বুড়ি। বেরিয়ে এল কন্যে, শুধাল:

'কী, খরগোশ নেই? কেউ বেরয় নি এখান থেকে?'

'ওই বেরিয়েছিল এক থুত্থুরে বুড়ি, জিগ্যেস করলে কিসের জন্যে

দাঁড়িয়ে আছি, বললাম — সোনার খরগোশের জন্যে। বুড়ি বললে, এখানে ওসব নেই; তা আমি ওকে ছেড়ে দিলাম।'

এই শুনে-না, কন্যে বলল:

'কী করলে তুমি! ওটাই তো সেই খরগোশ। এখন আর ওকে কোথাও পাওয়া যাবে না। শোনো বলি: আমি নিজেই সোনার খরগোশ হয়ে যাব, তুমি আমায় নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখবে। ওর হাতে দেবে না কিন্তু, তাহলেই ও টের পেয়ে যাবে, তোমায় আমায় দু'জনকেই কুটিকুটি করবে।'

তাই দাঁড়াল: কন্যে হয়ে গেল সোনার খরগোশ, তাকে সে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে নাগিনীকে বললে:

'এই আপনার খরগোশ, এবার আমি চললাম আপনার কাছ থেকে।'

'বেশ যাও।'

চলে গেল সে।

বাড়ি থেকে নাগিনী বেরতেই খরগোশ হয়ে গেল পরমাসুন্দরী কন্যে, ছুটল কুমারের সঙ্গ ধরতে। একসঙ্গে পালাতে লাগল দু'জনে। এদিকে নাগিনী বুঝতে পেরে গেছে যে ওটা খরগোশ নয়, তারই মেয়ে, ওদের ধরে পাকড়ে আনার জন্যে লোক পাঠাবার তোড়জোড় করতে লাগল। ওদিকে ওরা টের পায় — মাটি কঁকিয়ে উঠছে... কন্যে তখন বললে:

'এই রে, পিছু ধাওয়া করেছে আমাদের! আমি গম খেত হয়ে যাব, আর তুমি হবে বুড়ো। তোমায় যখন জিগ্যেস করবে "এক ছোকরা আর ছুকরিকে দেখেছ কি?" বলবে যে এখান দিয়ে তারা গেছে যখন গমের বীজ বোনা হচ্ছিল।'

তারপরে তো পেছু ধাওয়া করে উড়ে এল নাগ, বুড়োকে শুধোয়:

'আচ্ছা এখান দিয়ে ছোকরা-ছুকরিকে যেতে দেখেছ দাদু?'

বুড়ো বলে:

'গেছে এখান দিয়ে।'

নাগ শুধোয়:

'কতক্ষণ আগে?'

বুড়ো:

'যখন এই গম বোনা হচ্ছিল।'

নাগ বললে:

'আরে, এ গম যে কাটার সময় হয়ে এল, অথচ ওরা পালিয়েছে গতকাল।'

তাই ফিরে গেল। নাগকন্যা আবার হয়ে গেল মানুষ আর বুড়ো নওল কিশোর, ফের ছুট লাগাল।

বাড়ি ফিরল নাগ, নাগিনী শুধোয়:

'কী, ধরতে পারলে না? পথে দেখো নি কাউকে?'

নাগ বললে:

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম: গম পাহারা দিচ্ছিল বুড়ো, আমি তাকে শুধোলাম, এক ছোকরা আর ছুকরিকে সে দেখেছে কি, গেছে কি ওখান দিয়ে, সে বললে, "গেছে যখন এই গম বোনা হচ্ছিল।" আর গমের তো সময় হয়ে এসেছে কাটার। তাই ফিরে এলাম।'

নাগিনী তখন বললে:

'কী করেছ তুমি! এ যে ওরাই! ফের তাড়াতাড়ি ছোটো ওদের পেছনে।'

উড়ছে নাগ, কন্যা আর কুমার শুনতে পায় কী গর্জন করছে মাটি, উড়ে আসছে সে। কন্যে তখন বললে:

'আমি একটা পুরনো কেল্লা হয়ে যাব, তুমি হবে সেপাই। যেই জিগ্যেস করবে, "অমন কাউকে দেখেছ কি?" বলবে, "দেখেছিলাম যখন এই কেল্লাটা বানানো হচ্ছিল।"'

উড়ে এল নাগ, সেপাইকে জিগ্যেস করল:

'ওহে লশকর, এখান দিয়ে এক ছোকরা আর ছুকরিকে যেতে দেখেছ কি?'

সেপাই বললে:

'দেখেছিলাম যখন কেল্লাটা বানানো হচ্ছিল।'

নাগ বললে:

'ওরা পালিয়েছে গতকাল আর এ কেল্লা বানানো হয়েছে কে জানে কবে।'

এই বলে ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে নাগিনীকে বললে:

'দেখলাম এক সেপাই পায়চারি করছিল কেল্লার কাছে; জিগ্যেস করতে বলল, পালিয়েছে যখন কেল্লা গড়া হচ্ছিল; কেল্লা গড়া হয়েছে কে জানে কবে, অথচ ওদের তো পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে।'

এই শুনে নাগিনী বললে:

'কেন তুমি ওই সেপাইকে টুকরো টুকরো করো নি, গুঁড়ো করে দাও নি কেল্লাটা? এ যে ওরাই! এবার তাহলে আমাকেই যেতে হচ্ছে।'

এই বলে সে ছুটল।

ছুটছে নাগিনী, ছুটছে... আর ওরা দেখে মাটি গজরাচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে। কন্যে বললে:

'এবার আমরা গেছি: মা নিজেই আসছে! নাও, তোমায় আমি নদী করে দিই, আর নিজে হব কৈ মাছ।'

তাই হল।

নাগিনী ছুটে এসে নদীর দিকে চেয়ে বললে:

'কী এবার? পারলে পালাতে?'

নাগিনী হয়ে গেল দাঁতাল বান মাছ, ধরতে গেল কৈ মাছকে: এই ধরে-ধরে, কৈ অমনি তার কাঁটা-কাঁটা পাখনা মেলে তাকে ঠেকায়, ধরতে আর

পারে না। ধাওয়া ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে গেল। ঠিক করল নদীটাকেই গিলে খাবে। খায়, খায়, জল খেয়ে খেয়ে ভরে উঠল পেট, ঢোল হয়ে উঠল, আরো বেশি ঢোল হতেই — গেল ফেটে।

তখন মাছ-রূপী কন্যে বললে নদী-রূপী কুমারকে:

'আর আমাদের ভয় নেই। চলো যাই তোমার বাবা-মা'র কাছে তবে দেখো: বাড়ির ভেতরে গিয়ে সবাইকে চুমু খাবে, কিন্তু ভাইপোকে খেয়ো না, ওই কচিটাকে চুমু খেলেই আমায় ভুলে যাবে। আর আমি এখন কারো ঘরে খেতমজুরানির চাকরি নেব।'

তা ছেলে তো বাড়ি ঢুকল, সবাইকেই কুশল জানাল, কিন্তু মনে মনে তার ঐ চিন্তা, 'ভাইপোটিকে আদর না করে চলে কেমন ক'রে? সবাই যে আমায় খারাপ ভাববে!' কাছে গিয়ে খোকনকে চুমু খেল সে। আর চুমু খেতেই ভুলে গেল পরমাসুন্দরী কন্যের কথা।

দিন কাটল, কে জানে কতদিন, বিয়ে করার ইচ্ছে হল ছেলেটির। সবাই একটি ভালো কন্যের কথা বললে, কিন্তু যে তাকে নাগিনীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, তার কথা ভুলে গিয়ে সে এই মেয়েটির সঙ্গেই বাগ্দান করল।

তারপর বিয়ের আগে এক সন্ধ্যায় গাঁয়ের সব মেয়েকে ডাকা হল সাঁঝ-বাসরে। ডাকা হল সেই মেয়েটিকেও যার সঙ্গে সে পালিয়েছিল নাগিনীর কাছ থেকে, অবিশ্যি কেউ জানত না কে সে, এল কোত্থেকে। গান গাইতে লাগল সবাই, পিঠে বানাতে বসল। সে মেয়েটি ময়দার তাল দিয়ে নোটন-নোটনী পায়রা বানিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপরে; অমনি তারা জীবন্ত হয়ে ওড়াউড়ি করতে লাগল। নোটনী বকম বকম করে উঠল:

'ও নোটন, ও নোটন, ভুলে গেছ যে তোমার জন্যে আমি গম বুনেছিলাম মাঠে, নাগিনীর কাছে নিয়ে যাবে বলে রুটি বানিয়েছিলাম?'

নোটন বলে:

'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, ভুলে গেছি!'

ফের নোটনী শুধায়:

'ভুলে গেছ যে তোমার জন্যে আমি পাহাড় দু'খান করে নিপার নদী বইয়ে দিয়েছিলাম যাতে জাহাজ আসে, গম বেচে দাও তাদের কাছে?'

নোটন বলে:

'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, ভুলে গেছি!'

ফের নোটনী শুধায়:

'ভুলে গেছ যে আমরা দু'জনে গিয়েছিলাম সোনার খরগোশ ধরতে? আমায় ভুলে গেছ তুমি?'

নোটন জবাব দেয়:

'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, ভুলে গেছি!'

তখন কিন্তু সেই নাগিনী কন্যের কথা মনে পড়ে গেল কুমারের, নতুন কন্যেকে বিদায় দিয়ে মালা বদল করলে তার সঙ্গে। এখন তাদের দিন কাটছে সুখেস্বচ্ছন্দে।

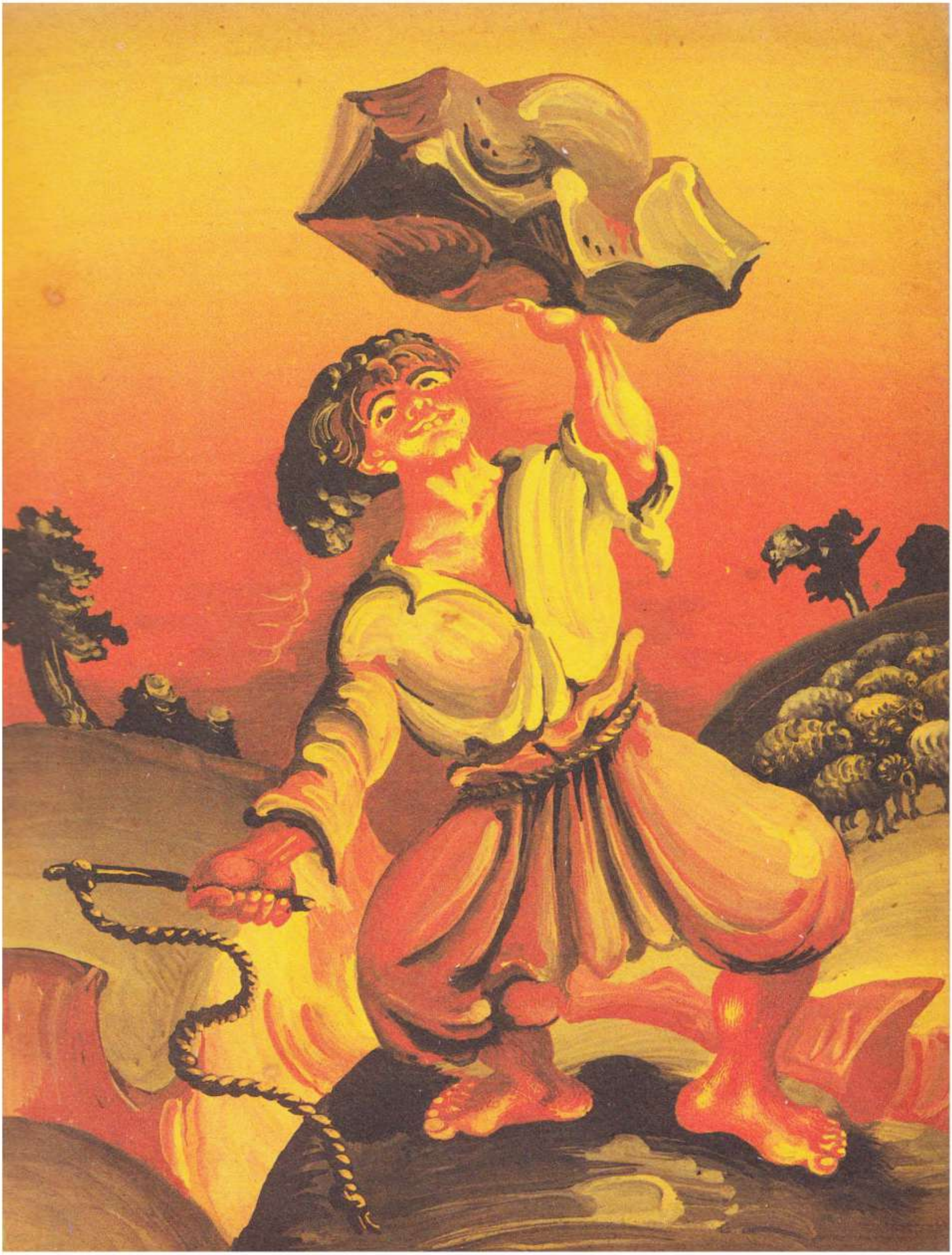
রাখাল ছেলে

এক-যে ছিল রাখাল ছেলে, একেবারে ছোটোটি থেকে কেবল ভেড়াই চরায়, আর কিছুই করত না, কিছুই জানত না। একদিন আকাশ থেকে পড়ল পাথর, আর পাথর বলতে পাথর — আট মন ভারি। পাথরটা নিয়ে মজা করতে ভালো লাগত রাখাল ছেলের: কখনো সেটা বাঁধত তার পাঁচনবাড়ির সঙ্গে, কখনো আকাশে ছুড়ে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে নিত, ঘুম ভেঙে দেখত পাথর তখনো আকাশে, মাটিতে পড়ে নি, আর যেই পড়ত, দেবে যেত মাটিতে। মা বকাবকি করত:

'অমন নুড়িপাথর নিয়ে খেলতে হয়? গায়ে আঁচড় লাগবে।'

ও সেসব খেয়ালই করে না।

এখন রাখাল ছেলে যেখানে থাকত, সে রাজ্যের রাজার পেছনে লাগল এক নাগ, এগুল রাজধানীর দিকে; মন তিরিশেক ওজনের এক-একটা পাথর উলটে-পালটে ছুড়ে দেয়, পুরী বানায় নিজের জন্যে। আবার দাবিও করে, রাজা তার কন্যের বিয়ে দিক তার সঙ্গে।



ভয় পেয়ে গেল রাজা, দূত পাঠাল সারা রাজ্যে, সারা রাজত্বিতে, এমন মহাবীর কেউ কি আছে যে নিধন করবে নাগকে। অনেক খোঁজাখুঁজি হল, কিন্তু তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। কথাটা কানে গেল রাখাল ছেলের, বড়াই করলে:

'ও নাগকে আমি আমার পাঁচনবাড়ি দিয়েই শেষ করে দিতে পারি।'

হয়ত এটা সে এমনি রগড় করেই বলেছিল, কিন্তু লোকেরা অমনি সেটা গিয়ে লাগাল রাজার কাছে; রাজাও তলব করল তাকে। এল রাখাল ছেলে রাজার কাছে, রাজা চেয়ে দেখে ভারি ছোটো, বললে:

'তুই যে এখনো ছোটো!'

আর সে তো বটেই, রাখাল ছেলে তো নাবালকই। কিন্তু সে বলে:

'তাতে কিছু এসে যায় না।'

রাজা তাকে দিল দুই বাহিনী সৈন্য। গেল সে সৈন্যদের কাছে, হুকুম দেয়, কী তার দাপট, যেন বিশ বছর ধরে সৈন্য চালিয়ে আসছে। অবাক হয়ে রাজা কেবল হাত ওলটায়। বলে:

'বাপ্‌রে!'

তারপর তো, নাগের পুরী থেকে হাত দশেক দূরে সে হুকুম দিলে:

'নজর রাখো, নাগের পুরীর চিমনি দিয়ে যেই ধোঁয়া বেরবে, বুঝবে আমি জিতলাম। আর যদি আগুন বেরয়, তার মানে আমায় সে হারিয়ে দিয়েছে।'

সৈন্য ফেলে রেখে গেল সে একা। আর নাগ ছিল এতই বলবান যে কাউকে সে তার ধারেকাছেও আসতে দিত না, ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলেই সে বহু হাত দূরেই লোককে থামিয়ে দিত। রাখাল ছেলেকে দেখেই নাগ ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল। কৈ না, এটাকে সরাতে পারল না।

নাগ শুধাল, 'তা বীরকিশোর, এসেছ কেন? লড়বে, নাকি মিটমাট করবে?'

'বীরকিশোর মিটমাট করতে আসে না, লড়তে আসে।'

নাগ বললে:

'আরে যাও, আরো তিন বছর হেসেখেলে কাটাও, তারপর এসো।'

'না, হেসেখেলে কাটানো আমার হয়ে গেছে।'

নাগ শুধাল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে লড়বে কী দিয়ে?'

'এই পাঁচনবাড়ি দিয়ে।'

আর তার পাঁচনবাড়ির দড়া বোধ হয় গোটা একটা বলদের চামড়া দিয়ে পাকানো, ডগায় পাথরটা বাঁধা।

নাগ বললে, 'তাহলে মারো আমায়!'

'না, তুমি আমায় মারবে প্রথম!'

এদিকে নাগের তরোয়াল তো সাত হাত লম্বা, হয়ত লোহার, হয়ত ইস্পাতের, কিন্তু রাখাল ছেলেকে তা দিয়ে ঘা মারতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল তরোয়াল।

'সামলাও তাহলে,' বলে রাখাল ছেলে, 'এবার আমি মারব।'

সেই চাবুকটা দিয়ে যেই মারা, নাগ অমনি লুটিয়ে পড়ল, ধোঁয়া উঠল চিমনি দিয়ে। সৈন্যদলের ওদিকে ভারি আনন্দ, বাজনদাররা বাজনা বাজায়, গান ধরে, রাজা আসে রাখাল ছেলেকে বরণ করতে, হাত ধরে নিয়ে যায় পুরীতে। রাজকন্যের বিয়ে দিল তার সঙ্গে, প্রাসাদ বানিয়ে দিল খানিক দূরে, সেখানে নিজের মতো থাকে তারা।

কিন্তু অন্য রাজারা বলাবলি করতে লাগল, 'এ আবার কী — নিজের মেয়ের বিয়ে কিনা রাখালের সঙ্গে!' রাজার নিজেরও আপসোস হচ্ছিল। তাই সবখানে চিঠ পাঠাল, এমন মহাবীর কি আছে রাখাল ছেলেকে যে

নিধন করতে পারে। পাওয়া গেল দু'জনকে। রাজা তাদের পাঠাল রাখাল ছেলের কাছে। রাখাল ছেলে ওদিকে বসে থাকে টেবিলের সামনে, বই পড়ে, শুনল কারা যেন তার সঙ্গে লড়তে আসবে।

এল তারা, রাখাল ছেলে শুধায়:

'কেন এলে বীরপুরুষেরা? লড়বে, নাকি মিটমাট করবে?'

ওরা বললে, 'হ্যাঁ, লড়ব বৈকি।'

রাখাল ছেলে বললে, 'তা বেশ, মারো!'

ওদের একজন ঘা মারল তার বাঁ কাঁধে, তরোয়াল ভেঙে পড়ল। অন্য জন আড়াআড়ি ঘা মারল তার ডান কাঁধে — কেবল কামিজটা খানিক ছিঁড়ে গেল। রাখাল ছেলে তখন উঠে দাঁড়িয়ে দুজনকে ধরে এমন ঠুকল যে ওদের হাড়গোড় সব খসে পড়ল। সেই হাড়গুলো সে তখন মুঠো করে নিল, রাজার ওপর এমন রাগ হয়েছিল যে তার কাছে গিয়ে কোনো সম্মান না দেখিয়ে সোজাসুজি বললে:

'কী, দেখছ তো? তোমারও এই দশা হবে!'

রাজা — ভোঁ দৌড়। সেই থেকে রাখাল ছেলেই সে রাজ্য চালায়।



কিরিল চামার

অনেক কাল আগে কিয়েভে ছিল এক প্রিন্স। আর কিয়েভের কাছেই থাকত নাগ। প্রতি বছর নাগকে ভেট দিতে হত: হয় কোনো নওল কুমার, নয় কুমারী। তারপরে তো একদিন প্রিন্সের মেয়েকে পাঠাবার পালা এল। করবার কিছু নেই: প্রজারা পাঠিয়েছে, প্রিন্সকেও পাঠাতে হয়। নিজের মেয়েকে তাই নাগের কাছে ভেট পাঠাল প্রিন্স।

আর মেয়েটি এত সুন্দরী, এত মিষ্টি যে কাহিনীতে বলবার নয়, কলম দিয়ে লিখবার নয়।

নাগ তার প্রেমে পড়ে গেল। একদিন মেয়েটি তাকে সোহাগ দেখিয়ে শুধাল:

‘আচ্ছা, দুনিয়ায় এমন লোক আছে যে তোমায় হারাতে পারে?’

নাগ বললে, ‘আছে, তেমন একজন আছে কিয়েভে, নিপার নদীর পাড়ে। বাড়িতে যখন আঁচ দেয়, ধোঁয়ায় আকাশ যায় ছেয়ে, আর নদীতে যখন চামড়া ভেজাবার জন্যে বেরয়, সে তো চামড়ার কাজ করে, চামার, তখন



একটা নয়, একসঙ্গে নিয়ে যায় বারোটা গরুর চামড়া। নিপারের জলে চামড়া ফুলে ওঠে। আমি একবার চামড়া টেনে ধরেছিলাম, ওর তাতে কিছু এসে যায় না: এমন টান দেয় যে আমাকে সমেতই পাড়ে টেনে তোলে আর-কি। কেবল এই লোকটাকেই আমি ভয় পাই।'

কন্যে কেবলি ভাবে কী করে এই খবরটা বাড়ি পাঠানো যায়, মুক্তি পেয়ে যাওয়া যায় বাবার কাছে। তার আশেপাশে জনপ্রাণী নেই, কেবল একটি পায়রা ছাড়া। সুখের দিনে কিয়েভে থাকতে তাকে সে পুষেছিল। অনেক ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত চিঠি লিখল বাবাকে:

'হেন তেন সব লিখে তারপর জানায়, তোমাদের ওখানে, বাবা, কিয়েভে একটি লোক আছে, নাম তার কিরিল, লোকে ডাকে কিরিল চামার বলে। বুড়ো লোকেদের দিয়ে ওকে বলে পাঠাও, নাগের সঙ্গে লড়ে আমায়, এই অভাগিনীকে সে কি বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে চায় না? আমার আপনার লোক, বাবা আমার, মিনতি করো ওর কাছে, কথা বার্তা বলে, ধনদৌলত দিয়ে। চলনে বলনে কোনো ঘাট হলে সে যেন মনে পুষে না রাখে, রাগ না করে। তোমার জন্যে, ওর জন্যে আমি সারা জীবন প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে।'

এইসব লিখে পায়রার ডানার তলে চিঠিটা বেঁধে পায়রাকে উড়িয়ে দিল জানলা দিয়ে। মেঘের কোলে উড়ে গিয়ে পায়রা পেঁছিল প্রিন্সের আঙিনায়। ছেলেমেয়েরা দেখতে পেল পায়রাকে।

চেঁচাতে লাগল, 'বাবা, বাবা, দেখ, দেখ, দিদির কাছ থেকে পায়রা এসেছে।'

প্রিন্সের প্রথমটা আনন্দ হয়েছিল, তারপর ভেবেচিন্তে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল: 'হতচ্ছাড়া পাষণ্ডটা আমার খুকিকে বুঝি মেরেই ফেলেছে।' তাহলেও পায়রাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, দেখে তার ডানার নিচে চিঠি।

সেটা নিয়ে সে পড়ল: হেন, তেন, যাসব লিখেছে মেয়ে। অমনি সে তলব করল সমস্ত পাত্রমিত্র, মণ্ডলদের:

‘এমন কেউ কি আছে, লোকে যাকে কিরিল চামার বলে ডাকে?’

‘আছে প্রিন্স, থাকে নিপার পাড়ে।’

‘কী করে ওর মন পাওয়া যায় যাতে রাগ না করে, সব কথা শোনে?’

নানান সলাপরামর্শ করল তারা, তারপর পাঠাল সবচেয়ে বুড়ো লোকদের। এল তারা তার কুটিরে, ভয়ে ভয়ে দরজা একটু ফাঁক করেই একেবারে আঁতকে উঠল। দেখে: তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মেঝের ওপর বসে আছে খোদ চামার, হাত দিয়ে বারোটা চামড়া ডলছে। যারা এসেছিল, তাদের একজন ‘খ্যাক’ করে কেসে ফেলল।

চমকে উঠল চামার, বারোটা চামড়াই ‘ফড়ড়, ফড়ড়’ করে ফেটে গেল। ফিরে চাইল চামার, ওরা একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে। মাথা নোয়ায়, বলে, এই হয়েছে, সেই হয়েছে, প্রিন্স তোমার কাছে মিনতি করে পাঠিয়েছে। ও একেবারে চেয়েও দেখতে চায় না, কানেও তুলতে চায় না: রেগে আগুন কেননা বারোটা চামড়া ফেড়ে গেল ওদের জন্যে।

ওরা আবার মিনতি শুরু করল, সাধাসাধি করল, হাতে পায়ে ধরল। ও শুনতেই চায় না। সাধ্যসাধনা করে করে শেষ পর্যন্ত চলে গেল মাথা নিচু ক'রে।

কী করা যায়? মন খাঁখাঁ করে প্রিন্সের, মন কেমন করে সমস্ত মণ্ডলদেরও।

আচ্ছা এবার জোয়ানদের পাঠালে হয় না?

পাঠানো হল জোয়ানদের — ওরাও কিছু পারল না। গুম হয়ে বসে থাকে চামার, ফোঁস ফোঁস করে। যেন কথাগুলো ওকে বলা হচ্ছে না। চামড়াগুলোর জন্যে সে কাঁই।

প্রিন্স তখন ঠিক করল কচিকাচাদের পাঠাবে। আহা, কেমন যে তাদের আগমন, কী যে মিনতি, কেমন যে তারা হাঁটু গেড়ে বসে, কী যে কাঁদে! চামার আর সইতে পারল না, নিজেই সে কেঁদে ফেলে বললে:

'তা বেশ, তোমাদের জন্যে করব।'

গেল সে প্রিন্সের কাছে।

বললে, 'দাও আমায় বারো পিপে আলকাতরা আর বারো গাড়ি শনের ফেঁসো।'

ফেঁসোগুলো দিয়ে জড়াল নিজেকে, ভালো করে তাতে আলকাতরা মাখাল আর এমন একটা তরোয়াল নিলে যা ধরো মন পাঁচেক ভারি। গেল নাগের কাছে। নাগ তখন শুধোয়:

'তা কিরিল, তুমি লড়তে এলে, নাকি মিটমাট করতে?'

'কোথায় মিটমাট। হতচ্ছাড়া পাষণ্ড, এলাম তোর সঙ্গে লড়তে।'

শুরু হল লড়াই, মাটি দুম দুম করে।

ছুটে গিয়ে নাগ কামড়ে ধরে কিরিলকে, দাঁতে উঠে আসে এক টুকরো আলকাতরা। আবার ছুটে গিয়ে কামড়ায়, উঠে আসে এক গোছা ফেঁসো। কিন্তু কিরিল এমন তরোয়াল চালায় যে নাগ একেবারে দেবে যায় মাটিতে। নাগের গা আগুন, গরম লাগে তার, নিপার নদীতে ছুটে গিয়ে জল খেয়ে খানিকটা ঠাণ্ডা হতে হতে চামার ফের শনের ফেঁসো জড়িয়ে নেয়, আলকাতরা মাখায়।

জল থেকে লাফিয়ে উঠে হতচ্ছাড়া পাষণ্ড ধেয়ে আসে চামারের দিকে, সেও তরোয়াল দিয়ে এক ঘা। আবার ধেয়ে আসে, চামারও তার তরোয়াল দিয়ে ঘায়ের পর ঘা।

লড়ছে, লড়ছে, ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে, ফুলকি ছুটছে। নাগকে কিরিল এমন গরম করে তুলল যেন কামারের হাপড়ে লাঙলের ফাল।

হতচ্ছাড়ার ওদিকে গলা ঘড়ঘড় করছে, খাবি খাচ্ছে সে, মাটি কাঁকিয়ে উঠছে।

লোকেরা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ে, হাত ধরাধরি করে দেখছে কী হয়। হঠাৎ নাগ — ধপাস! কেঁপে উঠল মাটি। কী হাততালি লোকেদের:

'সাবাস চামার, সাবাস!'

মানে, কিরিল মেরে ফেলল নাগকে, কন্যেকে নিয়ে গেল প্রিন্সের কাছে। প্রিন্স ভেবে পায় না কী করে তাকে ধন্যি জানায়। আর সেই থেকে যে জায়গাটায় কিরিল থাকত, তার নাম হয়েছে চামার টোলা।

উহ্

সে অনেকদিন আগেকার কথা, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার তখন হয়ত জন্মই হয় নি, সেই সেকালে বৌয়ের সঙ্গে নিজেদের মতো থাকত এক গরিব মানুষ।

তাদের ছিল একটি ছেলে, এমন সে টিংটিঙে মরকুটে যে বলবার নয়। কিছু একটা যে করবে, তা করে না, সারা দিন কাটায় চুল্লির ওপরকার মাচায়। মা যদি মাচায় খেতে দেয় খায়, না দেয় তো না খেয়েই পড়ে থাকে, আঙুলে কুটোটি নাড়ে না।

মা-বাপে বলে:

'তোকে নিয়ে কী করি বাছা, তোকে নিয়েই আমাদের জ্বালা। সব ছেলেমেয়েই তো তাদের মা-বাপের কত কাজ করে দেয়, আর তুই কেবল রুটির ভুষ্টিনাশ করিস!'



দুঃখু করে, দুঃখু করে, শেষে বুড়ি একদিন বললে:

'কী তুমি ভাবছ গো? ছেলের বয়স হল, কোনো কাজকম্ম জানে না। কোথাও ওকে একটা শিক্ষানবিশিতে বা কাজে ঢোকালে তো পারো। পরের ঘরে হয়ত কিছু একটা শিখে উঠবে।'

বাপ ওকে দিল খেতমজুরিতে।

তিন দিন থাকল সেখানে, তারপর পালাল। এসে উঠল চুল্লির ওপরকার মাচায়, বসে বসে কাটায় সেখানে।

বাপ তাকে মেরে ধরে নিয়ে গেল দর্জির কাছে, তালিম নিক।

সেখান থেকেও সে পালাল। দেওয়া হল কামারের কাছে, মুচির কাছে, কোনোই ফল হল না: ফের পালায়, তারপর ঐ মাচায়। কী করা যায়?

বুড়ো বললে, 'তুই অমুক, তুই তমুক, তোকে নিয়ে যাব এমন রাজ্যে যেখান থেকে পালাতে পারবি না।'

চলল তারা, চলল কতদিন কে জানে, এল এক অন্ধকার, নিঝুম বনে। হয়রান হয়ে পড়েছিল, দেখে আধপোড়া এক গাছের গুঁড়ি। বুড়ো গুঁড়ির ওপর বসে বললে:

'উহ্, ভারি জেরবার হয়ে পড়েছি।'

যেই না বলা, অমনি হঠাৎ কে জানে কোথা থেকে হাজির এক ক্ষুদে বুড়ো, একেবারে কোঁচকানো চামড়া, হাঁটু অবধি লম্বা সবুজ দাড়ি।

'কী চাই হে মনিষ্যি?'

বুড়ো অবাক: কোত্থেকে এল এই বিদঘুটেটা? জিগ্যেস করলে:

'আমি তোমায় ডেকেছিলাম? সে কী?'

'ডাকো নি মানে? বসলে গুঁড়ির ওপর, বললে 'উহ্!' '

'আরে আমি যে ভয়ানক হয়রান হয়ে পড়েছিলাম। তাই বলেছিলাম 'উহ্!' কিন্তু তুমি কে?'

'আমি বনের রাজা উহ্। তুমি চলেছ কোথায়?'

'যাচ্ছি ছেলেকে কোনো কাজে ঢোকাতে কিংবা তালিমে দিতে। সুজন লোকেদের কাছে। হয়ত এটা সেটা করতে শিখবে, জ্ঞানগম্যি হবে। আর দেশে যেখানেই খাটতে দিই পালিয়ে আসে, সারা দিন মাচায় বসে থাকে।'

'দাও ওকে আমার কাছে, জ্ঞানগম্যি শেখাব। শুধু কড়ার থাকবে: এক বছর বাদে ছেলের খোঁজে আসবে। ওকে চিনতে পারলে বাড়ি নিয়ে যাবে, না পারলে আরো এক বছর খাটবে আমার কাছে।'

বুড়ো বললে, 'বেশ।'

হাতে হাতে চাপড় মেরে চুক্তি হল। বুড়ো বাড়ি চলে গেল, ছেলে রইল উহের কাছে।

ছোকরাকে উহ্ নিয়ে গেল নিজের সঙ্গে, অন্য জগতে, মাটির নিচে সোজা পাতালে: তুলল নিজের সবুজ কুঠিতে। সে কুঠিতে সবই সবুজ: দেয়াল সবুজ, বসার চৌকি সবুজ, উহের গিন্নিও সবুজ, ছেলেমেয়েরা সবুজ, চাকরবাকরেরাও সবুজ।

ছোঁড়াটাকে বসিয়ে উহ্ চাকরবাকরদের হুকুম দিলে ওকে খাওয়াতে। দিল তাকে বাঁধাকপির সবুজ সুপ আর সবুজ জল। খাওয়া দাওয়া সারল সে।

উহ্ বললে, 'এবার কাজে যা: কাঠ ফেড়ে ঘরে আনবি।'

গেল ছোঁড়া। রইল পড়ে তার কাঠ ফাড়া, ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

উহ্ এসে দেখে সে ঘুমচ্ছে।

অমনি চাকরবাকরদের ডাকল উহ্, হুকুম দিলে কাঠ গাদি করতে, তার ওপর ছোঁড়াকে শুইয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

পুড়ে গেল ছোঁড়া!

ছাইগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিল উহ্, একটা পোড়াকাঠ পড়ল ছাই থেকে। তার ওপর জীয়ন জল ছিটিয়ে দিল উহ্ — ফের ছোঁড়া বেঁচে উঠল যেন কিছুই হয় নি।

হুকুম দিল তাকে কাঠ ফেড়ে সাজিয়ে রাখতে।

ফের সে ঘুমিয়ে পড়ল।

উহ্ আগুন ধরাল কাঠে, আবার পোড়াল তাকে, ছাই বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে একটা পোড়াকাঠে ছিটাল জীয়ন জল।

বেঁচে উঠল ছোঁড়া — দেখতে হল এমন সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না।

তিন বারের বারও উহ্ পোড়াল তাকে, পোড়া কাঠে আবার জীয়ন জল ছিটাল, মরকুটে ছেলেটা হয়ে দাঁড়াল এমন সুঠাম, সুকুমার এক কসাক যে ভাবা না যায়, কওয়া না যায়, কেবল শুনি সাঁঝের কথায়!

উহের কাছে ছেলে রইল এক বছর।

বাপ এল ছেলের খোঁজে। বনের ভেতর ঢুকে সেই আধপোড়া গুঁড়িটার ওপর বসে বললে:

'উহ্!'

উহ্ও অমনি গুঁড়ির তল থেকে বেরিয়ে এল।

'কুশল দাদু!'

'কুশল উহ্! ছেলের জন্যে এলাম।'

'বেশ চলো। ছেলেকে চিনতে পারলে — তোমার। না পারলে আরো একবছর আমার কাছে খাটবে।'

সবুজ কুঠিতে এল তারা।

এক থলে জোয়ার নিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল; অমনি উড়ে এল এক ঝাঁক চড়ুই।

'নাও দেখাও কে তোমার ছেলে।'

বুড়ো হতভম্ব: সব চড়ুই দেখতে একরকম, সবারই একই মূর্তি।

উহ্ বললে, 'তাহলে বাড়ি যাও। আরো একবছর তোমার ছেলে থাকবে আমার কাছে।'

পরের বছরও কাটল। ফের বুড়ো আসে উহের কাছে। এসে বসল গুঁড়ির ওপর:

'উহ্!'

উহ্ বেরিয়ে এল।

'নাও চলো, বেছে নাও তোমার ছেলেকে।'

নিয়ে গেল তাকে গোয়ালে, সেখানে ভেড়ার পাল, সবকটাই দেখতে একইরকম।

চেয়ে চেয়ে দেখে বুড়ো, ছেলেকে আর চিনতে পারে না।

উহ্ বললে, 'তাহলে বাড়ি যাও। আরো একবছর তোমার ছেলে থাকবে আমার কাছে।'

দুঃখু হল বুড়োর, কিন্তু কড়ার ওই রকমই, উপায় কিছু নেই।

তিন বছরও কাটল।

আবার বুড়ো এল ছেলেকে উদ্ধার করতে। বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। শোনে মাছি ভন ভন করছে তার কাছে।

মাছি তাড়িয়ে দেয়, ফের সেটা ভন ভন করে।

মাছি বসল তার কানে, হঠাৎ বুড়ো শোনে:

'বাবা, এটা আমি, তোমার ছেলে! উহ্ আমায় জ্ঞানগম্যি শিখিয়েছে,

এবার আমি ওর ওপর টেক্কা দেব। আবার সে তোমায় বলবে আমায় বেছে নিতে, অনেক পায়রা ছেড়ে দেবে। অন্য কোনো পায়রা তুমি নিও না, নেবে কেবল সেইটে যেটা বসে থাকবে নাশপাতি গাছের নিচে, দানা খুঁটবে না।'

ভারি আনন্দ হল বুড়োর, ভেবেছিল ছেলের সঙ্গে আরো খানিক কথা বলে, কিন্তু উড়ে গেল মাছি।

আধপোড়া গুঁড়ির কাছে এল বুড়ো:

'উহ্।'

বেরিয়ে এল উহ্, নিয়ে গেল তাকে তার বনের পাতাল রাজ্যে।

সবুজ কুঠিতে এনে ছড়িয়ে দিল এক বাটি রাই-দানা, পায়রা ডাকতে লাগল।

এল এমন কাতারে কাতারে যে বাপ্‌রে! আর সবই দেখতে একইরকম।

'নাও দাদু, নিজের ছেলেকে খুঁজে নাও।'

সব পায়রা দানা খুঁটছে, কেবল একটা বসে আছে নাশপাতি গাছের নিচে মনমরার মতো, দানা খুঁটছে না।

'এই আমার ছেলে।'

'তা ধরতে পেরেছ দাদু! নিয়ে যাও ছেলেকে।'

উহ্ সেই পায়রাটা নিয়ে ছুড়ে দিল তার বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে, হয়ে গেল সে এমন সুকুমার কসাক যা দুনিয়ায় কেউ কখনো দেখে নি।

বুড়োর আহ্লাদ আর মানে না, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়।

ছেলে আনন্দে ডগমগ।

'চল বাছা বাড়ি।'

চলেছে পথ ভেঙে। ছেলে গল্প করে উহের কাছে কেমন সে ছিল।

সব শুনে বাপ বললে:

'তা বেশ। তিন বছর ভূতের বেগার খাটলি, কিছুই রোজগার করলি না: গরিবই রয়ে গেলাম আমরা। তবে তাতে দুঃখু নেই। বেঁচে যে ফিরলি, সেই ভাগ্যি।'

'তুমি দুঃখু ক'রো না বাবা। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চলল এগিয়ে, দেখে শিকার চলছে: আশেপাশের বাবুরা শেয়ালের পিছু ধাওয়া করেছে।

ছেলে শিকারী কুকুর হয়ে গিয়ে বাপকে বললে:

'বাবুরা তোমার কাছে শিকারী কুকুর কিনতে চাইবে, তিনশ' রুব্‌লে বেচে দিও, তবে গলার বেল্টটা দেবে না কিন্তু।'

আর নিজে ছুটল শেয়ালের পেছনে। ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল তাকে। বাবুরা বেরিয়ে এল বন থেকে, বুড়োকে শুধোয়:

'কুকুরটা দাদু তোমার?'

'আমার।'

'বাহাদুর শিকারী। বেচে দাও আমাদের।'

'তা কেনো।'

'কত চাও?'

'তিনশ' রুব্‌ল, তবে গলার বেল্টটা বাদে।'

'তোমার ও বেল্টে আমাদের কী দরকার! ওর চেয়ে ভালো বেল্টই আমরা কিনব। এই নাও টাকা, কুকুর আমাদের।'

কুকুর নিয়ে আবার তাড়া শুরু করল শেয়ালদের। কুকুর কিন্তু

শেয়ালের পেছনে না ছুটে সোজা ঢুকে গেল বনের মধ্যে। সেখানে আবার ছেলে হয়ে ফিরে এল বাপের কাছে।

আবার চলেছে তারা, শেষে বাবা বললে:

'কিন্তু তিনশ' রুব্‌লে আমাদের কী হবে বাছা? কেবল একটা জোত পত্তন করা যাবে, বাড়িটা মেরামত হবে। কিন্তু খাওয়া-পরার জন্যে তো কিছু থাকবে না। ফের সেই হাত খালি।'

'ঠিক আছে বাবা, দুঃখু করো না। এখুনি তিতির শিকারীদের সঙ্গে দেখা হবে, আমি বাজপাখি হয়ে যাচ্ছি, তুমি আমায় তিনশ' রুব্‌লে বেচে দিও। তবে দেখো, টুপিটা বেচবে না কিন্তু।'

এল তারা মাঠে। শিকারীরাও পেঁছিল তাদের কাছে। দেখে, বুড়োর আছে বাজপাখি।

'কী দাদু, তোমার বাজপাখিটা বেচবে আমাদের?'

'তা কেনো।'

'কত চাও ওর জন্যে?'

'তিনশ' রুব্‌ল দাও। পাখিটা বেচব, তবে টুপি ছাড়া।'

'এহ্, তোমার টুপি আমাদের কী দরকার। আমরা ওকে জরির টুপি পরাব।'

হাতে হাতে চাপড় মেরে কথা হয়ে গেল। তিনশ' রুব্‌ল পেয়ে বুড়ো চলল এগিয়ে।

শিকারীরা বাজপাখিটা ছাড়ল তিতির ধরার জন্যে, পাখি ওদিকে সোজা বনের ভেতর। আছড়ে পড়ল মাটিতে, ফের হয়ে গেল ছেলে, বাপের সঙ্গ ধরল।

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ, এবার খানিকটা দুধেভাতে থাকা যাবে।'

'দাঁড়াও বাবা, আরো কিছু আছে। মেলার ওখান দিয়ে যাবার সময়

আমি হয়ে যাব ঘোড়া। তোমায় দেবে হাজার রুবল। কেবল লাগামটা রেখে দিও।'

এল তারা মেলায়। ঘোড়া হয়ে গেল ছেলে। এমন টগবগে ঘোড়া যে কাছে যেতেই ভয় হয়। বুড়ো তার লাগাম ধরে টানে, আর ঘোড়া তার কড়িয়ালি কামড়ে ছিঁড়তে চায়, খুর ঠোকে মাটিতে। অমনি গিজগিজ করে বুড়োকে ছেঁকে ধরল ব্যাপারিরা, দরাদরি শুরু করল।

'লাগাম ছাড়া হাজার রুবল,' বুড়ো বলে, 'তাহলেই দিয়ে দেব।'

'তোমার লাগামের আমাদের কী দরকার! সোনা-বাঁধানো লাগাম কিনব ওর জন্যে,' বলে ব্যাপারিরা।

দিতে চায় পাঁচশ'। কিন্তু দাদু অটল, ঘোড়া ছাড়ে না। হঠাৎ এল এক কানা বেদে:

'কত দেবে গো ঘোড়ার জন্যে?'

'লাগাম ছাড়া এক হাজার।'

'এহ্! বড়ো বেশি হাঁকছ বাপুজি! নাও লাগাম সমেত পাঁচশ'।'

'উঁহু, পোষাবে না!' বলে বুড়ো।

'তাহলে নাও ছয়শ'।'

বেদে যতই দরাদরি করুক, বুড়োকে ছাড়ে না।

'বেশ, হাজারই নাও বাপু, তবে লাগাম সমেত।'

'না, লাগাম আমার।'

'ওগো ভালোমানুষের পো, কে কোথায় শুনেছে যে ঘোড়া বিক্রি হচ্ছে লাগাম ছাড়াই? এক হাত থেকে অন্য হাতে ওকে যে তুলে দিলে, লাগাম না দিয়ে সেটা দেখাবে কেমন করে?'

'সে যা বোঝো, লাগাম আমার!'

'নাও বাপু, আমি তোমায় আরো পাঁচ রুব্ল ছাড়ছি, দাও ঘোড়াটা।'

দাদু ভাবল: লাগামের দাম হতে পারে ধরো এই গোটা তিন সিকি, আর বেদে দিতে চাচ্ছে পাঁচ রুব্ল।

বাস, দিয়ে দিলে।

হাতে হাতে চাপড় মেরে রফা হল, বুড়ো চলল বাড়ি, বেদেও ঘোড়ায় চাপল। এদিকে লোকটা তো আর বেদে নয়, খোদ উহ্। ছেলেটার ওপর টেক্কা দিয়েছে। ঘোড়া ছোটাল সে তীরের মতো, গাছগুলোর ওপর দিয়ে, মেঘের তল দিয়ে। কেবলি চাঁট মারে ঘোড়া, উহ্‌কে ফেলে দিতে চায়। কিন্তু সেটি আর হয় না!

এল তারা বনে, পাতালের রাজ্যে। ঘরে ঢুকল উহ্, ঘোড়াকে বেঁধে রেখে গেল অলিন্দে।

বৌকে উহ্ বললে, 'পাকড়েছি যাহোক বেটা হারামজাদাকে। সন্ধের দিকে ওকে জল খাওয়াতে নিয়ে যেও।'

সন্ধেয় বৌ ঘোড়া নিয়ে গেল নদীতে। জল খেতে গেল ঘোড়া আর জল খাবার ছল করে ঘোড়া কেবলি নেমে যায় নদীর গভীরে।

বৌ ছোটে তার পেছনে, চেঁচায়, গালাগালি দেয়। ঘোড়া কিন্তু তলিয়ে যেতেই থাকে, আর মাথা ঝাঁকানি দিতেই গিন্নির হাত থেকে খসে গেল লাগাম। জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে ঘোড়া হয়ে গেল কৈ মাছ।

গিন্নি চিৎকার করে উঠল। ছুটে এল উহ্, তিলেক দেরি না করেই বান মাছ হয়ে পিছু ধাওয়া করল কৈয়ের।

'কৈ, ও কৈ, রূপ থইথই, মুখ ফেরা, তোর সঙ্গে দুটো গালগল্প করি!'

কৈ কিন্তু জবাব দেয়:

'কথা কইতে চাও সাঙাত, বলো, আমি অমনিই শুনতে পাব।'

অনেকখন কৈয়ের পেছু ধাওয়া করল বান মাছ, ধরতে আর পারে না। কৈ ওদিকে হয়রান হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

হঠাৎ দেখে তীরে স্নানের ঘাট। রাজকন্যে তখন ঘাটে এসেছিল গা ধুতে। কৈ তখন লাফিয়ে পড়ল তীরে, হয়ে গেল সোনা বাঁধানো তামড়ি মণির অঙ্গুরী, গড়িয়ে গেল তার পায়ের কাছে। চোখে পড়ল রাজকন্যের।

'আরে সুন্দর অঙ্গুরী যে!' তুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরল সেটা।

বাড়ি ফিরে বড়াই করে:

'কী সুন্দর যে একটা অঙ্গুরী পেয়েছি!'

রাজাও মুগ্ধ হয় দেখে।

উহ্ দেখতে পেয়েছিল যে কৈ আংটি হয়ে গেছে, সেও অমনি সদাগর হয়ে গেল রাজার কাছে:

'দণ্ডবৎ হুজুর জাঁহাপনা। আপনার কাছে আমার আর্জি। আপনার কন্যেকে আজ্ঞা করুন আমার অঙ্গুরী ফিরিয়ে দিক। আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের রাজার কাছে, জলে পড়ে গেল, কন্যে কুড়িয়ে নিয়েছে।'

কন্যেকে তলব করল রাজা।

'অঙ্গুরী দিয়ে দাও খুকি, তার মালিক এসেছে।'

কান্নাকাটি করল রাজকন্যে, মেঝেতে পা দাপাল:

'দেব না! সদাগরকে টাকা দিয়ে দাও যত চায়, অঙ্গুরী আমার।'

উহ্ও ছাড়ে না।

'নিজেদের রাজার কাছে এ অঙ্গুরী না নিয়ে গেলে আমার যে প্রাণ যাবে!'

রাজা আবার বোঝায়:

'দিয়ে দাও গো খুকি, নইলে আমাদের জন্যে এ মানুষটি বিপদে পড়বে।'

রাজকন্যে বললে, 'তাই যদি হয়, তাহলে ওটা আমিও পাব না, তুমিও পাবে না!'

এই বলে সে অঙ্গুরী ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে।

অঙ্গুরীও খানখান হয়ে সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ল শতেক মণিতে।

কেবল একটা মণি গড়িয়ে গিয়েছিল রাজকন্যের জুতোর তলায়।

সেও সেটা পায়ে চেপে রাখল।

উহ্ ওদিকে চিল হয়ে গিয়ে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল মণির দানা। সব খেয়ে একেবারে ভারি হয়ে উঠল, নড়তেও বড়ো একটা পারে না।

তবে রাজকন্যের জুতোর তলায় একটা মণি তার নজরে পড়ে নি। সে মণিটা গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে হয়ে গেল শ্যেন পাখি, ছোঁ মারল চিলের ওপর।

চিল উড়তে আর পারে না। কয়েক বার তার মাথা ঠোকরাল শ্যেন পাখি, প্রাণবায়ু তার বেরিয়ে গেল।

তাই উহ্ আর রইল না, শ্যেন ওদিকে মাটিতে আছড়ে পড়ে হয়ে গেল সুকুমার তরুণ।

এমন সুকুমার যে তাকে দেখামাত্রই ভালোবেসে ফেলল রাজকন্যে। রাজাকে বললে:

'যা বলবে বলো, আমি কেবল এই তরুণকেই বিয়ে করব, আর কাউকে নয়।'

রাজার তো ইচ্ছে ছিল না, সাধারণ এক কসাকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে

দেয়, কিন্তু কী করা যায়! অনেক ভেবে ভেবে শেষে হুকুম দিল: সিজাও বিয়ার, বানাও সুরা, ডাকো নেমন্তন্নে।

এমন আনন্দে ঘটা করে বিয়ে হল যে সারা বছর লোকে তার কথা বলাবলি করেছে।

আমিও ছিলাম ভাই, সুরা, মধুও খাই, পড়ে নি পেটে গিয়ে, ঝরেছে দাড়ি দিয়ে — তাই দাড়ি আমার পাকা।



গড়ানে-মটর

ছিল একজন লোক। তার ছয় ছেলে, একটি মেয়ে।

গেল তারা জমি চষতে, বোনকে বললে যেন খাবার নিয়ে যায়। বোন বললে:

'কিন্তু কোথায় তোমরা চষবে? আমি তো জানি না।'

ওরা বললে:

'যেখানে চষব, বাড়ি থেকে সে জায়গাটা পর্যন্ত ফালের দাগ দিয়ে যাব। তুই সেই দাগ ধরে চলে যাবি।'

এই বলে চলে গেল তারা।

এখন সেই মাঠের কাছে বনে এক নাগ থাকত।

দাগটা সে বুজিয়ে দিতে শুরু করল। আর নিজে তার বদলে আরেকটা দাগ টেনে নিয়ে গেল তার নিজের পুরী পর্যন্ত।



মেয়েটি এদিকে ভাইদের জন্যে খাবার নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সেই দাগ ধরে।

যেতে যেতে যেতে গিয়ে পেঁছিল একেবারে নাগের আঙিনায়। নাগও তাকে ধরে রাখল সেখানে।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরল ছেলেরা, মাকে বলে:

'সারা দিন হাল দিলাম, তুমি আমাদের খাবারও পাঠালে না।'

'পাঠালাম না মানে? আলেঙ্কা যে নিয়ে গেল! আমি ভাবছিলাম তোমাদের সঙ্গে ফিরবে। পথ হারাল নাকি?'

ভাইরা বললে:

'খুঁজতে যেতে হয়।'

ছয় ভাই সেই নতুন দাগ ধরে পেঁছিল নাগের আঙিনায়। এসে দেখে: বোনটি সেখানে।

'দাদারা আমার, নাগ যে আসবে, কোথায় তোমাদের লুকিয়ে রাখি। তোমাদের যে খেয়ে ফেলবে!'

নাগ ওদিকে উড়ে আসছে।

ফোঁস ফোঁস করছে, 'মানুষের গন্ধ পাঁও! তা কী হে ছোকরারা, লড়বে নাকি মিটমাট করে নেবে?'

ওরা চেঁচাল, 'না! লড়ব!'

'চলো তাহলে লোহার ঝাড়াইতলায়।'

গেল তারা লোহার ঝাড়াইতলায় লড়তে।

বেশিক্ষণ লড়াই চলল না: নাগ ঘা মারতেই তারা লুটিয়ে পড়ল লোহার ঝাড়াইতলায়। আধমরা অবস্থায় তাদের তুলে নিয়ে নাগ ফেলে দিলে গভীর অন্ধকূপে।

মা-বাপে ওদিকে ছেলেদের পথ চেয়ে আছে — নেই তো নেই-ই।

একদিন লোকটার বৌ গেল নদীতে কাপড়চোপড় কাচতে, দেখে — রাস্তায় একটা মটরদানা গড়াচ্ছে। মটরদানাটা তুলে নিয়ে সে খেয়ে ফেলল।

তারপর তো ছেলে হল তার। নাম রাখল গড়ানে-মটর।

ছেলে বেড়ে ওঠে, অল্প বয়সেই হয়ে উঠল প্রকাণ্ড।

একদিন বাপ-ছেলেয় মিলে কুয়ো খুঁড়ছিল — খুঁড়তে খুঁড়তে গিয়ে ঠেকল এক মস্তো পাথরে।

বাপ ছুটে গেল লোক ডাকতে, পাথরটা যাতে তুলে ফেলতে সাহায্য করে।

বাপ যেতে না যেতেই গড়ানে-মটর নিজেই পাথরটা তুলে ফেলে দিলে। এল লোকজনেরা, ব্যাপার দেখে একেবারে থ'। গায়ে ওর এত জোর ভয় পেয়ে গেল, চেয়েছিল তাকে খুন করতে। ছেলে ওদিকে সে পাথর ওপরে ছুঁড়ে লুফে নেয়।

এমন কাণ্ড দেখে লোকেরা পালিয়ে গেল দিগ্‌বিদিকে।

বাপে-ছেলেতে আরো খোঁড়ে — খুঁড়তে খুঁড়তে গিয়ে ঠেকল মস্তো এক লোহার চাঙড়ে।

গড়ানে-মটর সেটা টেনে তুলে লুকিয়ে রাখল।

একদিন গড়ানে-মটর বাপকে শুধায়, মাকে শুধায়:

'আমার যেন ভাইবোন ছিল? তাই না?'

ওরা বললে, 'হারে বাছা, ছিল তোর বোন আর ছয় ভাই। তবে বাছা এই হয়েছে, সেই হয়েছে।'

সব কথা তাকে বলল।

ছেলে বলে, 'তাহলে আমি ওদের খুঁজতে যাব।'

বাপ-মায়ে কত বোঝায়:

'যাস নে বাছা: ছয়জনে গেল, ফিরল না, তুই তো একা, নির্ঘাৎ তুই মারা পড়বি!'

'না যাব! ওরা যে আমাদেরই রক্তমাংস, উদ্ধার করব না, সে কি হয়!'

যে লোহাটা খুঁড়ে তুলেছিল, সেটা নিয়ে সে গেল কামারের কাছে।

বললে, 'আমায় একটা তরোয়াল বানিয়ে দাও বেশ বড়োসড়ো।'

এমন তরোয়াল কামার বানাল যে কামারশাল থেকে সেটা বার করে আনতে পারল বহু কষ্টে। গড়ানে-মটর তরোয়ালটা নিয়ে বোঁ করে ছুঁড়ে দিল আকাশে। বাপকে বললে:

'ঘুমতে যাচ্ছি, বারো দিন পরে, তরোয়াল যখন মাটিতে এসে পড়তে যাবে, আমায় জাগিয়ে দিও।'

এই বলে সে শুল।

তেরো দিনের দিন শোঁ শোঁ শব্দ করে তরোয়াল এসে পড়ছে। ছেলেকে জাগিয়ে দিল বাবা। ছেলে লাফিয়ে উঠে মুঠো বাড়িয়ে ধরল। তরোয়াল যেই সেই মুঠোতে আছড়ে পড়া, অমনি দু'খান হয়ে গেল। ছেলে বললে:

'না, এ তরোয়াল নিয়ে ভাইবোনদের খুঁজতে যাওয়া চলে না। অন্যরকম তরোয়াল বানাতে হবে।'

তরোয়াল নিয়ে ফের সে গেল কামারের কাছে।

বললে, 'নাও, ঢেলে সাজো, যেন আমার যুগ্যি হয়।'

আগের চেয়েও বড়ো একটা তরোয়াল বানাল কামার। এ তরোয়ালটাও আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে বারো দিনের জন্যে ঘুমতে গেল গড়ানে-মটর।

তেরো দিনের দিন তরোয়াল ফিরে আসছে, গোঁ গোঁ করছে, থরথর করছে মাটি। জাগিয়ে দেওয়া হল গড়ানে-মটরকে, লাফিয়ে উঠে সে মুঠো বাড়িয়ে ধরল। তরোয়াল তাতে আছড়ে পড়ে কেবল বেঁকে গেল খানিকটা।

'হ্যাঁ, এ তরোয়াল নিয়ে খুঁজতে বেরনো যায় ভাইবোনদের। রুটি পাকাও মা, সেঁকে খড়খড়ে করো — যাব এবার।'

নিল সেই তরোয়ালটা, থলেয় ভরল খড়খড়ে শুকনো রুটি, বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গেল সে ফালের সেই পুরনো দাগ ধরে, এখন তা চোখেই বড়ো একটা পড়ে না, পেঁছিল বনে।

চলল বন দিয়ে, যেতে যেতে যেতে এল মস্তো এক বার-দুয়ারিতে।

ঢুকল আঙিনায়, তারপর পুরীর ভেতর, নাগ নেই — বোনটি একা।

'কুশল তোমায় চাঁদবরণী কন্যে,' বললে গড়ানে-মটর।

'কুশল বীরকুমার! কেন এলে এখানে, নাগ উড়ে আসবে, খেয়ে ফেলবে তোমায়।'

'হয়ত খেতে পারবে না! কিন্তু তুমি কে?'

'ছিলাম আমি বাপের মায়ের এক মেয়ে। নাগ আমায় হরণ করেছে। ছয় ভাই আমায় উদ্ধার করতে এসেছিল, পারল না।'

'কোথায় তারা?'

'নাগ তাদের অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছে, বেঁচে কি আছে, বেঁচে কি নেই, জানি না।'

'হয়ত আমি তোমায় উদ্ধার করব,' বললে গড়ানে-মটর।

'কোথায় তুমি! ছয়জনে পারল না, তুমি তো একলা!'

গড়ানে-মটর জবাবে বললে, 'ও কিছু না।'

জানলার কাছে বসে অপেক্ষায় রইল।

এইসময় উড়ে এল নাগ। ভেতরে ঢুকে নাক বাড়ায়:

'হাঁউ-মাউ-খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ!'

'গন্ধ পাবে না কেন,' বললে গড়ানে-মটর, 'আমি যে এখানে।'

'আরে ছোকরা! কী চাই তোমার? লড়বে নাকি মিটমাট করে নেবে?'

'কোথায় মিটমাট, লড়ব!' বললে গড়ানে-মটর।

'তাহলে চলো লোহার ঝাড়াইতলায়।'

'চলো!'

এল ওরা। নাগ বলে:

'মারো আমায়।'

গড়ানে-মটর বলে, 'উঁহু, তুমি আগে মারবে।'

নাগ তাকে এমন চেপে ধরল যে গোড়ালি পর্যন্ত তার বসে গেল লোহার ঝাড়াইতলায়।

পা টেনে তুলে গড়ানে-মটর এমন তরোয়াল হাঁকাল যে হাঁটু পর্যন্ত নাগ দেবে গেল লোহায়।

পা ছাড়িয়ে নিয়ে নাগ গড়ানে-মটরকে এমন ঘা মারল যে সেও দেবে গেল হাঁটু পর্যন্ত।

আর গড়ানে-মটর দ্বিতীয় বার তরোয়াল হাঁকাতেই নাগ ঝাড়াইতলায় ডুবে গেল কোমর পর্যন্ত, তিন বারের বার মারতেই নাগ অক্কা।

গেল সে তখন মাটির নিচের তল-ভাঁড়ারে, গভীর অন্ধকূপে, তালা খুলে বার করল ভাইদের।

কোনোরকমে ধুঁকছিল ওরা। জড়ো করল সে ভাইদের, সঙ্গে নিল বোন

আলেঙকাকে, নাগের যত সোনারূপো ছিল সব নিয়ে রওনা দিল বাড়ির দিকে।

যাচ্ছে ওরা, গড়ানে-মটর কিন্তু বলে নি যে তাদের সে ভাই।

গেল কতদিন ধরে কে জানে, জিরিয়ে নিতে বসল ওকগাছের তলে। লড়াইয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল গড়ানে-মটর, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছয় ভাই ওদিকে পরামর্শ করতে লাগল:

'লোকে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করবে, ছয়জন আমরা কাবু করতে পারলাম না নাগকে, আর একাই ও মেরে ফেলল তাকে। তার ওপর নাগের ধনদৌলত, সেও তো ও নিজেই নেবে।'

সলাপরামর্শ ক'রে ক'রে ঠিক হল: এখন ও ঘুমচ্ছে, কোনো সাড় নেই। গাছের ছাল দিয়ে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যাক ওকগাছের সঙ্গে, খুলে বেরতে যেন না পারে, জন্তুজানোয়াররা ওকে কামড়ে খাক।

যেমন বলন, তেমনি করণ। ওকে বেঁধে রেখে চলে গেল তারা।

গড়ানে-মটর ওদিকে ঘুমচ্ছে, কোনো সাড় নেই। ঘুমাল সারা দিন, সারা রাত, জেগে দেখে গাছের সঙ্গে সে বাঁধা। এমন ঝাঁকুনি দিল যে শিকড় সমেত উপড়ে এল ওকগাছ। সেই ওকগাছ ঘাড়ে নিয়ে সে চলল বাড়ির দিকে। বাড়ির কাছাকাছি এসে শুনতে পেল: ভাইয়েরা ফিরেছে, মাকে জিগ্যেস করছে:

'আচ্ছা মা, তোমার আরো ছেলে ছিল?'

'থাকবে না কেন! ছিল গড়ানে-মটর, তোমাদের উদ্ধার করতে গেছে।'

ওরা তখন বলাবলি করে:

'তাহলে ওকেই আমরা বেঁধে রেখে এসেছি! বাঁধন খুলে দিতে হয়।'

আর গড়ানে-মটর তখন সেই ওকগাছটা এমন আছড়ে ফেলল চালের ওপর যে বাড়ি ভেঙে পড়ে-পড়ে।

বললে, 'তোমরা যখন এমন লোক, থাকো এখানে। আমি চললাম দীন দুনিয়া ঘুরে দেখতে।'

এই বলে কাঁধের ওপর তরোয়াল বাগিয়ে চলে গেল।

চলেছে সে, চলেছে, দেখে — এদিকে পাহাড়, ওদিকে পাহাড়, মাঝখানে এক মানুষ: হাতে-পায়ে ভর দিয়ে পাহাড়গুলোকে ঠেলে সরাচ্ছে। গড়ানে-মটর বললে:

'কুশল হোক!'

'কুশল!'

'তা কী করছ হে সুজন?'

'পাহাড় ঠেলছি, এখান দিয়ে পথ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু চলেছ কোথায়?'

'সুখ খুঁজতে।'

'আমিও তাই। নাম কী তোমার?'

'পাহাড়-ঠেলিয়ে। তোমার নাম?'

'গড়ানে-মটর। চলো একসঙ্গেই যাই।'

'চলো।'

চলল ওরা। যায়, যায়... দেখে বনের মধ্যে এক মানুষ: হাত দিয়ে যেই ঝাপট মারে, ওকগাছ অমনি শিকড় শুদ্ধ উপড়ে আসে।

'কুশল হোক!'

'কুশল!'

'তা কী করছ হে সুজন?'

'গাছ-টাছ উপড়িয়ে পথ করছি, হাঁটাচলায় সুবিধে হবে।'

'কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?'

'সুখের খোঁজে।'

'আমরাও তাই। নাম কী তোমার?'

'ওক-উপড়িয়ে। তোমাদের নাম?'

'গড়ানে-মটর আর পাহাড়-ঠেলিয়ে। চলো একসঙ্গে যাই।'

'চলো।'

চলল তিনজনে। যায়, যায়, যায়... দেখে প্রকাণ্ড মোচওয়ালা একটা মানুষ, ঝুঁকে আছে নদীর ওপর: মোচে যেই পাক দেয়, সরে যায় নদীর জল, হেঁটে পেরবার পথ হয়ে যায়।

ওরা বললে:

'কুশল হোক!'

'কুশল!'

'কী করছ হে সুজন?'

'জল ঠেকিয়ে রাখছি যাতে নদী পেরনো যায়।'

'কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?'

'সুখ খুঁজতে।'

'আমরাও তাই। তা নাম কী তোমার?'

'পাকানো-মোচ। তোমাদের নাম?'

'গড়ানে-মটর, পাহাড়-ঠেলিয়ে, ওক-উপড়িয়ে। চলো একসঙ্গে যাই।

'চলো।'

চলল তারা। যেতে কোনো কষ্ট নেই: পথে পাহাড় পড়ল — পাহাড়-ঠেলিয়ে তা সরিয়ে দেয়; যেখানে বন — ওক-উপড়িয়ে গাছ তুলে ফেলে; যেখানে নদী — জল ফাঁক করে দেয় পাকানো-মোচ।

তারপরে তো, এল ওরা মস্তো এক বনে। দেখে, বনের মধ্যে কুঁড়ে। ঢুকল কুঁড়ের ভেতর — কেউ নেই। গড়ানে-মটর বললে:

'এখানেই আমরা রাত কাটাব।'

রাত কাটল।

পরের দিন গড়ানে-মটর বললে:

'পাহাড়-ঠেলিয়ে, তুমি ঘরে থাকো, রান্না করবে। আমরা তিনজনে চললাম শিকারে।'

চলে গেল ওরা। পাহাড়-ঠেলিয়ে এদিকে সিদ্ধ-টিদ্ধ, ভাজাভুজি সব ক'রে একটু গড়িয়ে নিতে গেল। হঠাৎ কে যেন টোকা দেয় দরজায়:

'দরজা খোল!'

পাহাড়-ঠেলিয়ে বলে, 'রাজা-রাজড়া তো নও, নিজেই খোলো।'

দরজা খুলে গেল। আবার কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

'চৌকাঠ পার করে দাও।'

'রাজা-রাজড়া তো নও, নিজেই পেরোও।'

তার পরে তো ভেতরে ঢুকল এক পুঁচকে বুড়ো, দাড়ি ওদিকে সাত হাত লম্বা। পাহাড়-ঠেলিয়ের ঝুঁটি ধরে বুড়ো তাকে টাঙিয়ে রাখল দেয়ালের পেরেকে। তারপর সেদ্ধ-ভাজা যা ছিল সব খেয়ে দেয়ে উধাও।

পাহাড়-ঠেলিয়ে আঁকুপাঁকু করে, ঝুঁটির একগোছা চুল ছিঁড়ে কোনোরকমে

ছাড়ান পেল, ফের শুরু করল রাঁধতে। এল বন্ধুরা, তার ওদিকে তখনো শেষ হয় নি রান্না।

'রাঁধতে এত দেরি হল যে?'

'ওই, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

খাওয়া দাওয়া হল, ঘুমতে গেল সবাই। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে গড়ানে-মটর বললে:

'আজ তাহলে ওক-উপড়িয়ে থাকবে, আমরা যাব শিকারে।'

গেল শিকারে। আর ওক-উপড়িয়ে রান্না করল, ভাজাভুজি করল, একটু গড়িয়ে নিতে গেল। শোনে: দরজায় কে টোকা দিচ্ছে:

'দরজা খোলো!'

'রাজা-রাজড়া তো নও, নিজেই খোলো!'

'চৌকাঠ পার করে দাও।'

'রাজা-রাজড়া তো নও, নিজেই পেরোও।'

তারপরে তো ঢুকল এক পুঁচকে বুড়ো, দাড়ি তার সাত হাত লম্বা। ওক-উপড়িয়ের ঝুঁটি ধরে টাঙিয়ে রাখল পেরেকে। আর নিজে সে সেদ্ধ-টেদ্ধ, ভাজাভুজি যা কিছু ছিল সব খেল, দেল, বাস উধাও।

ওক-উপড়িয়ে ছটফট করে, ঝটপট করে, কোনোরকমে পেরেক থেকে খসে শুরু করল রান্নাবান্না।

এল বন্ধুরা।

'রান্নায় এত দেরি হল কেন রে?'

বলে, 'ওই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

পাহাড়-ঠেলিয়ে ওদিকে চুপ করে থাকে, সে তো বুঝতে পেরেছিল কী ঘটেছে।

পরের দিন রইল পাকানো-মোচ, তার সঙ্গেও সেই ব্যাপার। গড়ানে-মটর তখন বললে:

'এহ্, রান্না করতে তোমাদের বড়ো আলিস্যি। ঠিক আছে, কাল তোমরা শিকারে যাও, আমি বাড়ি থাকব।'

পরের দিনও সেই একই ব্যাপার। ওরা তিনজন গেল শিকারে, গড়ানে-মটর রইল বাড়িতে।

তারপরে তো রান্নাবান্না, ভাজাভুজি করে সে গেল একটু গড়াতে। শোনে, দরজায় টোকা।

'দরজা খোলো।'

গড়ানে-মটর বললে, 'একটু দাঁড়াও, খুলছি।'

দরজা খুলে দেখে এক এই-টুকুনি বুড়ো, সাত হাত লম্বা তার দাড়ি।

'চৌকাঠ পার করে দাও আমায়।'

চৌকাঠ থেকে তুলে নিয়ে তাকে বসাল গড়ানে-মটর। বুড়ো কিন্তু লাফিয়ে আসতে চায়।

'কী চাই তোর?' জিগ্যেস করে গড়ানে-মটর।

বুড়ো বলে, 'সেটা দেখবি এইবার,' এই বলে বুড়ো গড়ানে-মটরের ঝুঁটি ধরতে গেল, আর গড়ানে-মটর 'কে রে তুই?' বলেই খপ করে চেপে ধরল তার দাড়ি।

কুড়ুল নিয়ে বুড়োকে ধরে নিয়ে গেল ওকগাছের কাছে, ওকগাছ চিরে তার ফাটলের মধ্যে বুড়োর দাড়ি ঢুকিয়ে বন্ধ করে রাখল।

বললে, 'এই যখন তুমি, আমার ঝুঁটি ধরতে চাও, তখন আমি না ফেরা পর্যন্ত বসে থাক এখানে।'

ফিরল কুঁড়েয়। বন্ধুরা এসে গিয়েছিল।

'রান্নার কী হল?'

'অনেকখন সারা!'

খাওয়া দাওয়া হল। গড়ানে-মটর তখন বললে:

'চলো আমার সঙ্গে, তোমাদের একটা মজা দেখাব।'

এল ওরা ওকগাছটার কাছে, সেখানে বুড়োও নেই, ওকগাছও নেই। শিকড় সমেত গাছ উপড়ে বুড়ো সেটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

গড়ানে-মটর তখন সঙ্গীদের বললে কী হয়েছিল, ওরাও কবুল করল যে বুড়ো তাদের ঝুঁটি ধরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

'এহ্,' বললে গড়ানে-মটর, 'এমনধারা লোক যখন, চলো, যাই, ওকে খুঁজে বার করি।'

আর গাছটা বুড়ো টেনে নিয়ে গেছে যেখান দিয়ে সেখানে তার দাগ পড়েছিল, সেই দাগ ধরে চলল ওরা।

এইভাবেই ওরা এল এক গভীর গর্তের কাছে। এমন গভীর যে তল দেখা যায় না। গড়ানে-মটর বললে:

'পাহাড়-ঠেলিয়ে, তুমি নিচে নেমে দেখো তো।'

'ধুত্তোর! বয়ে গেছে নামতে।'

'তাহলে তুমি, ওক-উপড়িয়ে!'

ওক-উপড়িয়ে, পাকানো-মোচ কেউ-ই রাজি হল না।

গড়ানে-মটর বললে, 'এই যখন ব্যাপার, তখন আমি নিজেই নামব। দড়ি পাকাও।'

দড়ি পাকাল ওরা। তার ডগাটা হাতে জড়িয়ে গড়ানে-মটর বললে:

'নামাও আমায়।'

দাড়ি ছাড়তে লাগল ওরা। ছাড়ল অনেকখন ধরে, শেষ পর্যন্ত যাহোক তলে পৌঁছল।

গড়ানে-মটর সেখানে হাঁটতে শুরু করল, দেখে — মস্তো এক পুরী। ঢুকল ভেতরে, চারিদিক একেবারে সোনাদানা, মণিরত্নে ঝকঝক করছে। অন্দরের মহলে মহলে ঘোরে সে, দেখে — ছুটে আসছে রাজকন্যে, কী যে তার রূপ, কী সে রূপ, তা গল্প করে বলার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়।

বলে, 'সর্বনাশ, কেন তুমি এলে সুজন?'

ও জবাব দেয়, 'মানে, আমি গড়ানে-মটর, লম্বা দাড়িওয়ালা ক্ষুদে বুড়োকে খুঁজছি।'

কন্যে বললে, 'আরে, বুড়ো সে ওকগাছ থেকে দাড়ি ছাড়াচ্ছে। যেও না ওর কাছে, তোমায় সে মেরে ফেলবে! অনেককে ও মেরেছে।'

গড়ানে-মটর বললে:

'আমায় মারতে পারবে না। আমিই ওর দাড়ি গাছে আটকে দিয়েছি। কিন্তু তুমি কি এখানে থাক?'

'আমি রাজকন্যে, বুড়ো আমায় হরণ করে বন্দী করে রেখেছে।'

'তাহলে তোমায় আমি উদ্ধার করব। নিয়ে চলো বুড়োর কাছে।'

কন্যেও নিয়ে গেল তাকে।

দেখে সত্যিই, বসে আছে বুড়ো, গাছ থেকে দাড়ি খসিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে।

গড়ানে-মটরকে দেখেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল:

‘কেন এলি এখানে? লড়বি নাকি মিটমাট করে নিবি?’

গড়ানে-মটর বললে, ‘মিটমাট নয়, লড়তে চাই।’

শুরু হল লড়াই।

ঘা মারে গড়ানে-মটর, মারে, মারে, শেষ পর্যন্ত তার তরোয়াল দিয়ে মেরেই ফেলল বুড়োকে।

তখন রাজকন্যে আর সে সমস্ত সোনাদানা মণিরত্ন তিনটে বস্তায় পুরে গেল সেই গর্তটার কাছে, যেখান দিয়ে নিচে নেমেছিল। গড়ানে-মটর চিৎকার করল:

‘ওহে ভাইয়েরা, আছ তো তোমরা?’

‘আছি।’

দড়িতে একটা বস্তা বেঁধে সেটা টেনে তুলতে বলল সে:

‘এটা তোমাদের জন্যে।’

টেনে তুলে আবার দড়ি নামিয়ে দিল ওরা। এবার দ্বিতীয় বস্তাটা সে বাঁধল:

‘এটাও তোমাদের জন্যে।’

বাঁধল তৃতীয় বস্তাটাও — যা জড়ো করেছিল, সবই দিয়ে দিল। তারপর দড়িতে বাঁধল রাজকন্যেকে:

চেঁচিয়ে বললে, ‘আর এটা কিন্তু আমার।’

রাজকন্যেকে টেনে তুলল তিনজনে। এবার গড়ানে-মটরকে তোলার পালা। ওরা কিন্তু যুক্তি করলে:

‘কী হবে ওকে তুলে? রাজকন্যেও হোক আমাদেরই। ওকে ওপর পর্যন্ত তুলে ছেড়ে দেব। পড়ে মরুক।’

গড়ানে-মটর কিন্তু টের পেয়েছিল কী ওদের মতলব। দড়িতে মস্তো একটা পাথর বেঁধে চেঁচাল:

'টেনে তোলো আমায়।'

ওরা সেটা অনেক ওপর পর্যন্ত তুলে দড়ি ছেড়ে দিল, পাথরও পড়ল দ্দম করে!

গড়ানে-মটর বললে, 'বটে, তা বেশ।'

চলে গেল সেই অন্য জগতে। যায়, যায়, হঠাৎ ঘনিয়ে এল মেঘ, শুরু হল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি। মাথা বাঁচানোর জন্যে দাঁড়াল সে ওকগাছের নিচে।

হঠাৎ শোনে: গাছে পাখির বাসায় চিঁচিঁ করছে ঈগলের ছানারা। গাছে উঠল সে, ছানাদের ঢেকে দিল ডালপালা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে যেতে উড়ে এল মস্ত এক পাখি, ছানাগুলোর বাবা, ঈগল। দেখে, ছানারা ঢাকাঢুকো দেওয়া, শুধাল:

'কে তোমাদের ঢেকে দিয়েছে?'

ছানারা কিন্তু বলে:

'যদি খেয়ে না ফেলো, তাহলে বলব।'

'না, খাব না।'

'ওই যে গাছের তলে বসে আছে একজন মানুষ, সেই আমাদের ঢেকে দিয়ে গেছে।'

গড়ানে-মটরের কাছে উড়ে গিয়ে ঈগল বললে:

'বলো, কী তোমার চাই, আমি দেব। এই প্রথম আমার ছানারা বেঁচে রইল, কেননা যেই আমি উড়ে যাই, বৃষ্টি নামে, বাসা ওদের ভাসিয়ে দেয়।'

গড়ানে-মটর বললে, 'যেখান থেকে আমি এসেছি, সেখানে আমায় নিয়ে চলো।'

'বড়ো ধান্ধায় ফেললে আমায়। তা কী আর করা যাবে, যেতেই হবে

উড়ে। ছয় পিপে মাংস আর ছয় পিপে জল নেব সঙ্গে। উড়তে উড়তে যখন ডান দিকে মাথা ফেরাব, তুমি আমার মুখে দেবে এক টুকরো মাংস, যখন বাঁ দিকে ফেরাব, দিও কিছু জল। নইলে উড়ে পেঁছিতে পারব না, পড়ে যাব।'

নিল ওরা ছয় পিপে মাংস আর ছয় পিপে জল। ঈগলের পিঠে চাপল গড়ানে-মটর, উড়তে থাকল।

উড়ছে তো উড়ছেই। ডান দিকে মাথা ফেরায় ঈগল, গড়ানে-মটর তার মুখে মাংস গুঁজে দেয়, বাঁয়ে ফেরায় — দেয় খানিকটা করে জল।

উড়ল অনেকদিন ধরে, এই পেঁছিল বলে... ডান দিকে মাথা ফেরাল ঈগল, কিন্তু পিপেতে তখন আর মাংস নেই। গড়ানে-মটর তখন তার পা থেকে এক টুকরো মাংস কেটে পুরে দিল ঈগলের হাঁয়ের মধ্যে।

উড়ে এল তারা ওপরে, ঈগল শুধায়:

'শেষ বারের বার অমন সুন্দর মাংস কী দিয়েছিলে আমায়?'

গড়ানে-মটর তার পা দেখাল:

বললে, 'এই দিয়েছিলাম।'

ঈগল তখন উগলে দিল মাংসটা, উড়ে গিয়ে নিয়ে এল জলপড়া। মাংসটা পায়ে বসিয়ে সে জল ছিটিয়ে দিতেই তা জুড়ে গেল।

এবার বাসায় ফিরে গেল ঈগল আর গড়ানে-মটর চলল তার বন্ধুদের খোঁজে। তারা ওদিকে চলে গিয়েছিল রাজকন্যের বাবার কাছে, থাকে সেখানে আর ঝগড়াঝাঁটি করে নিজেদের মধ্যে: প্রত্যেকেই চায় রাজকন্যেকে বিয়ে করতে, মিটমাট আর হয় না।

হঠাৎ গড়ানে-মটর এসে হাজির।

ভয় পেয়ে গেল তারা, ভাবল গড়ানে-মটর ওদের খুন করবে।

সে কিন্তু বললে:

'নিজের সহোদর ভাইয়েরাই যখন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তোমাদের আর বলবার কী আছে। মাপ করতেই হয়।'

আর ক্ষমা করে দিলে।

নিজে বিয়ে করল সেই রাজকন্যেকে, দিন কাটাচ্ছে সুখে-স্বচ্ছন্দে।



ইভান-পালোয়ান

সে অনেককাল আগের কথা, ভয়ংকর এক নাগ হানা দিতে লাগল এক বসতিতে। সবাইকে সে খেয়ে উজাড় করল, রইল শুধু এক বুড়ো।

নাগ ঠিক করল, 'তা এটাকে কাল খাওয়া যাবে।'

এইসময় কাঙাল এক ছোকরা যাচ্ছিল বসতি দিয়ে। গিয়ে তো উঠল সেই বুড়োর কাছে, রাত কাটাতে চাইল সেখানে।

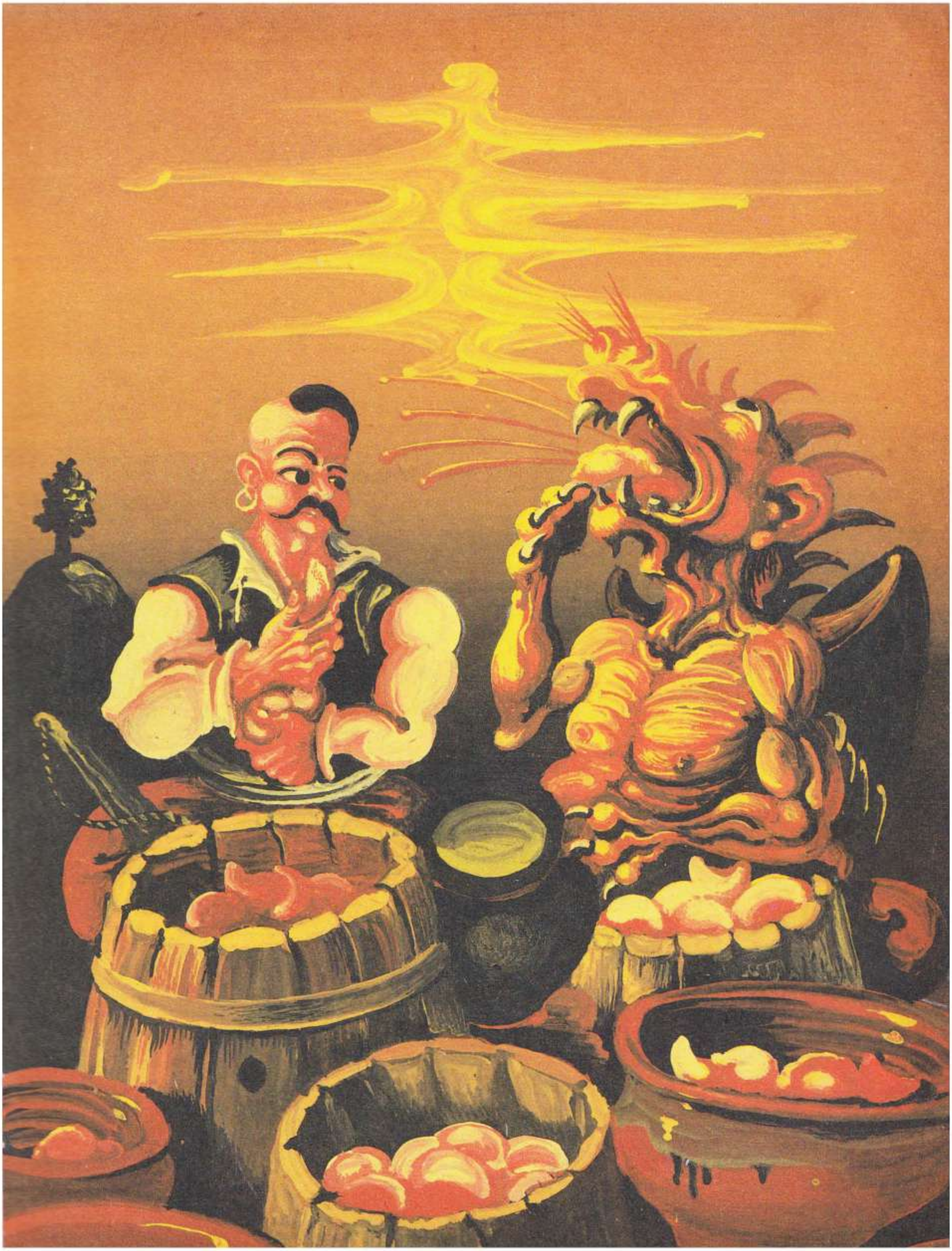
বুড়ো শুধায়, 'জীবনে তোর ঘেন্না ধরে গেল নাকি?'

'কেন?' বলে সেই কাঙাল ছোকরা।

বুড়ো তখন তাকে বলতে লাগল যে নাগ সেখানকার সবাইকে খেয়ে উজাড় করেছে, কাল তাকে খাবার কথা ভাবছে।

ছোকরা বললে, 'ও কিছু না, নিজেই গলায় ঠেকে মরবে।'

সকালে তো উড়ে এল নাগ, ছোকরাকে দেখে ভারি তার আনন্দ:



'মন্দ নয় তো! ছিল একটা, হয়েছে দুটো।'

ছোকরা বলে:

'দেখো, গলায় ঠেকে না মরো।'

অবাক হল নাগ:

'মানে, আমার চেয়ে তোর জোর বেশি?'

'বটেই তো।'

'কোথায় তোর শক্তি, আর দ্যাখ আমার জোর,' এই বলে সে একটা পাথর নিয়ে এমন চাপ দিল যে একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল সেটা।

ছোকরা বললে, 'ও আর কী। এমন করে চাপ দাও যাতে পাথর থেকে জল বেরয়।'

এই বলে, তাকের ওপর যে নেকড়া-জড়ানো ছানা ছিল, যেন সেটা পাথর এই ভাব করে চিপতেই জল বেরিয়ে এল।

বললে, 'এমনি করে চিপতে হয়!'

নাগ বললে, 'যাক গে, চলো যাই, তুমি হবে আমার বন্ধু।'

ছোকরা বললে:

'তাহলে আমি সর্দার।'

চলল ওরা। নাগ তাকে শুধায়:

'তা তোমার নাম কী?'

ছোকরা বলে, 'ইভান-প্যালোয়ান।'

তাই শুনে-না, একেবারেই ভয় পেয়ে গেল নাগ। ভাবে, 'আমাকেই আবার মেরে না ফেলে।'

খাবার সময় হল, নাগ বলে:

'যাও ছোকরা, একটা বলদ নিয়ে এসো, রান্না করব।'

গেল ছোকরা।

গোটা একটা বলদ তো দূরের কথা, একটা ঠ্যাং নিয়ে যেতে পারলেও হয়। পালের মধ্যে ঢুকে বলদগুলোর লেজে লেজে বাঁধতে লাগল সে।

নাগ বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেই এল।

'কী করছ হে ছোকরা?'

'এক একটা করে বলদ নিয়ে যাব কী! সবকটাকে একসঙ্গে নিয়ে যাব।'

'চুলোয় যাও তুমি, আমার গোটা পালটাকেই তুমি সাবাড় করবে দেখছি!'

একটা বলদের চামড়া ছাড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল সেটা, চামড়াটা দিল ছোকরাকে।

বললে, 'যাও তো, চামড়ার খোল ভর্তি করে জল নিয়ে এসো।'

চামড়া নিল ছোকরা, কোনোরকমে টেনে নিয়ে গেল পাতকুয়ো পর্যন্ত। জলে ডুবাল চামড়া, জলে তো ডুবাল, টেনে আর তুলতে পারে না।

কী আর করে, গাছ থেকে কেটে ছোট একটা খন্তা বানিয়ে ঘোরে কুয়োর চারধারে, সেখানকার মাটি খোঁড়ে। ছুটে এল নাগ:

'কী করছ তুমি?'

'আরে তোমার জন্যে চামড়ায় করে জল নিয়ে যাব মানে। এক দফাতেই গোটা পাতকুয়োটা তুলে নিয়ে যাব।'

'ধুত্তোরি,' নাগ বললে বটে, তবে এমন শক্তিধর ভেবে ভয় পেল, নিজেই নিয়ে গেল চামড়ায় জল ভরে।

বললে, 'তাহলে শোনো, বরং কাঠ নিয়ে এসো। শুকনো একটা ওকগাছ উপড়িয়ে নিও, তাতেই আমাদের কুলিয়ে যাবে।'

'আহা মরি, লোক পেলে বটে, টুকিটাকি বোঝা বইব নাকি তোমার জন্যে! গোটা বিশেক গাছ হলেও নয় কথা ছিল,' ভাব করলে যেন রেগে গেছে, গেল না গাছ ওপড়াতে।

নাগ তো রান্নাবান্না করে গিলতে বসল।

ছোকরা কিন্তু খেতে চায় না। জানে, ওযে ভারি কম খায় তা দেখে নাগ তক্ষুনি ধরে ফেলবে যে ওর গায়ে জোর নেই। আর হাণ্ডায় যখন খাবার অল্পই বাকি, তখন ছোকরা খেতে বসল, সেটুকু খেয়ে বললে:

'পেট ভরল না!'

নাগ বললে, 'যাক গে, পেট যখন ভরে নি, চলো যাই আমার মায়ের কাছে, পুলি পিঠে রেঁধে দেবে।'

'তা যেতে চাও যখন, চলো,' বললে ছোকরা, কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণে: 'এইবার গেছি!'

তারপরে তো শুরু হল খাওয়া: নাগ খেয়ে চলেছে তো চলেছেই, ছোকরা ওদিকে তার জামার তলে, আস্তিনের মধ্যে ঢোকায় পুলি পিঠে। বিশ হাণ্ডা পিঠে দেওয়া হল। আর সে কেবল তা লুকিয়েই চলেছে।

শেষ হল খাওয়া, নাগ বললে:

'চলো যাই পাথর নিয়ে খেলি।'

'যাবে যখন, চলো' জবাব দিলে ছোকরা।

নাগ পাথরে এমন মোচড় দিলে যে ফুলকি ছুটল।

ছোকরা বললে, 'ফুঃ, ও আর কী। এই দ্যাখো এমনভাবে মোচড়াবে যাতে জল বেরয়,' এই বলে সে জামার তলে লুকনো পিঠেগুলোর সঙ্গে পাথর চেপে ধরতেই ছিটকে বেরল রস।

বললে, 'নাও, এইভাবে মোচড়াও! আরো, আরো, জোরে: দাও চাপ!'

একেবারে ভয় পেয়ে গেল নাগ, তাহলেও ইভান-পালোয়ানকে বললে:

'এবার এসো দেখি, কে সবচেয়ে জোরে শিস দিতে পারে?'

'বেশ, দাও শিস।'

এমন শিস দিল নাগ যে গাছগুলো নুয়ে পড়ল।

'এবার তাহলে কী করা যায়?' ভাবে ইভান, দেখে: পড়ে আছে এক টুকরো লোহা। সেদিকে তাকিয়ে ইভান নাগকে বললে:

'চোখ বুঁজে থাকো, নইলে এমন শিস দেব যে তোমার চোখ উপড়ে আসবে।'

চোখ বুঁজল নাগ, আর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ইভান-পালোয়ান এমন ঘা মারল তার কপালে যে তার মুখ একেবারে কুঁচকে গেল।

নাগ বললে, 'ঠিকই বলেছ, চোখ আমার সত্যিই উপড়ে আসছিল আর-কি।'

আর ইভানের সঙ্গে এক জায়গায় যাতে থাকতে না হয়, তার জন্যে ওকে এক বাড়ি বানিয়ে দিল গাঁয়ের শেষে।

ছোকরা থাকতে লাগল একা। আর নাগ ওদিকে মায়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে — কী ক'রে ছোকরাকে ভবনদী পার করিয়ে দেওয়া যায়।

ঠিক করল, 'ওকে পুড়িয়েই মারা যাক।'

ছোকরা কিন্তু শুনতে পেয়েছিল, সে রাতটা লুকিয়ে কাটাল অন্য কোথাও।

পুড়িয়ে দেওয়া হল বাড়ি, ইভান ওদিকে এসে বাড়ির জায়গাটায় দাঁড়িয়ে গা থেকে ছাই ঝাড়ছে। যেন এইমাত্র সে ছাইভস্মের মধ্যে থেকে উঠল।

এল নাগ।

'সে কী রে ছোকরা, এখনো বেঁচে?'

'বেঁচেই আছি, শুধু রাতে মনে হয়েছিল যেন ডাঁশ একটা কামড়াল।'

নাগ ভাবলে, 'না বাবা, এমন লোকের কাছ থেকে সরে পড়াই ভালো!'

এই ভেবে ঐসব এলাকা থেকে এমন উধাও হল যে আর টিকিটিও দেখা যায় নি।

উড়ন্ত জাহাজ

থাকত এক বুড়ো আর বুড়ি। তাদের তিন ছেলে: দু'জন বুদ্ধিমান, একজন বোকা। বুদ্ধিমানদের ভালোবাসত বুড়োবুড়ি। হপ্তায় হপ্তায় বুড়ি কামিজ দেয় বুদ্ধিমানদের, আর বোকাটাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সবাই, বকাবকি করে। চুল্লির ওপরকার মাচায় সে বসে থাকে খাদি কাপড়ের কামিজ গায়ে; বুড়ি খেতে দিলে খায়, না দিলে উপোসেই কাটায়।

একদিন গাঁয়ে খবর এল: রাজা তার মেয়ের বিয়ে দেবে, গোটা রাজ্যের লোককে ডাকবে নেমন্তন্নে। আর মেয়েকে রাজা সম্প্রদান করবে তাকে, যে উড়ন্ত জাহাজ বানিয়ে তাতে করে উড়ে আসবে।

বুদ্ধিমান ভাইয়েরা গেল বনে।

গাছ কেটে ভাবতে লাগল উড়ন্ত জাহাজ বানাতে পারলে হয়।

তাদের কাছে এল এক থুথুরে বুড়ো:



'ভগবান মঙ্গল করুন তোমাদের! দাও বাছা পাইপ ধরাবার একটু আগুন।'

'তোমায় নিয়ে বুড়ো ঝামেলার সময় নেই আমাদের।'

ফের ভাবতে লাগল।

'শুয়োর খাওয়াবার সুন্দর পাতনা বানাবে বাছারা,' বললে বুড়ো, রাজকন্যের দর্শনও আর পেতে হচ্ছে না!'

এই বলেই বুড়ো একেবারে অন্তর্ধান করল। ভাইয়েরা ঠোকাঠুকি করে, কিছুই আর দাঁড়ায় না।

বড়ো ভাই বললে, 'চল নগরে যাই ঘোড়ায় চেপে, রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে না হলেও অন্তত ভোজ তো খাওয়া যাবে।'

বুড়োবুড়ি তাদের আশীর্বাদ করল, যাত্রার জন্যে সব গোছগাছ করে দিল। বুড়ি সেঁকে তুলল গমের রুটি, শুয়োরের ছানা রোস্ট করল, ঝাল-ঝাল মদ সঙ্গে দিলে এক ভাঁড়।

ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলে দু'ভাই।

বোকাটা শুনল যে ভাইয়েরা রওনা দিয়েছে। বললে:

'দাদারা যেখানে গেছে, আমিও যাব সেখানে।'

মা বলে, 'তুই বোকাটা যাবি কোথায়? বনে তোকে নেকড়েতেই খেয়ে ফেলবে।'

'না, খাবে না।'

কেবলি 'যাব আর যাব!' কিছুতেই আর মানে না।

তা বুড়ি তখন তার থলেতে দিল বাসি রুটি আর এক ভাঁড় জল, এগিয়ে দিল বাড়ি থেকে।

বোকাটা যায় বন দিয়ে। পথে এক থুত্থুরে বুড়োর সঙ্গে দেখা। এমন হদ্দ বুড়ো যে দাড়ি একেবারে শাদা — নেমেছে কোমর পর্যন্ত।

'কুশল হোক দাদু!'

'কুশল বাছা!'

'কোথায় দাদু চলেছ তুমি?'

'দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াই, কেউ কষ্টে পড়লে উদ্ধার করি। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ?'

'আমি রাজবাড়িতে যাচ্ছি ভোজ খেতে।'

'আরে, তুমি তেমন জাহাজ বানাতে পারো নাকি, যা নিজে নিজেই উড়বে?'

'না, তো, পারি না।'

'তাহলে যাচ্ছ কেন?'

'মানে দাদারা যে গেছে, তাই আমিও চললাম। হয়ত আমার কপাল ফিরে যাবে।'

'তা যাক গে। এসো একটু জিরিয়ে নিই, কিছু পেটে পড়ুক। থলি থেকে বার করো কী তোমার আছে।'

'যা আছে সে তোমার মুখে রুচবে না দাদু: আছে কেবল বাসি রুটি।'

'ও কিছু না, বার করো যা আছে।'

থলের মধ্যে থেকে রুটি বার করল বোকা। তবে তা কালোও নয়, ছাতা-পড়াও নয়, মা যা দিয়েছিল, এ যে একেবারে গমের ময়দার ফুলোফুলো পাঁউরুটি — পালে-পার্বনে বাবুদের বাড়িতে যা খাওয়া হয়। বোকাটা হতভম্ব, দাদু কিন্তু হাসে।

তা জিরিয়ে নিল তারা, খেল যেমন খাওয়ার কথা। খাবার জন্যে বোকাকে ধন্যি দিয়ে বুড়ো বললে:

'শোন ছেলে তোকে যা বলি। বনের মধ্যে গিয়ে সবচেয়ে বড়ো ওকগাছটা খুঁজে বার করবি, ডালগুলো যার আড়াআড়ি মেলা। তিনবার কুড়ুলের কোপ মারবি সে গাছে, আর নিজে উপুড় হয়ে পড়ে থাকবি

যতক্ষণ না কেউ ডাকছে। তখন তোর জাহাজ তৈরি হয়ে যাবে। উঠে বসবি তাতে, উড়ে যাবি যেখানে তোর দরকার। শুধু দেখিস, পথে যাদের পাবি সবাইকেই তুলে নিবি!'

দাদুকে কৃতজ্ঞতা জানাল বোকা, বিদায় নিলে তারা। বোকা গেল বনে, যে ওকগাছটার ডালপালা আড়াআড়ি মেলা, খুঁজে পেল সেটাকে, তিনবার কুড়ুল বসাল তাতে, নিজে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমচ্ছে তো ঘুমচ্ছেই, হঠাৎ শোনে কে যেন তাকে ডাকছে:

'ওঠো বন্ধু, সৌভাগ্য তোমার এল ব'লে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বোকা দেখে: দাঁড়িয়ে আছে জাহাজ, আগাগোড়া সোনার, মাস্তুল তার রুপোর, রেশমি পাল, এমন ফুলে উঠেছে যে উঠে বসলেই হল।

বেশি কিছু আর না ভেবে সে উঠে পড়ল জাহাজে, পাল টানটান হয়ে উড়তে লাগল সেটা।

উড়তে লাগল হুহু করে, সুন্দর ভেসে ভেসে! জাহাজ উড়ছে তো উড়ছেই, আর নিজে ও কেবলি তাকিয়ে দেখে মাটির দিকে। দেখতে পেল একটা লোক মাটিতে শুয়ে পড়ে কান পেতে কী শুনছে। বোকা চেঁচিয়ে উঠল:

'কুশল হোক ভালোমানুষ! কী করছেন আপনি?'

'শুনছি রাজবাড়িতে ভোজ খেতে লোকেরা সব জুটেছে কিনা।'

'আর আপনি কি রাজার কাছে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'চলুন আমার সঙ্গে, পেঁাছে দেব।'

লোকটা উঠে বসল, উড়ে চলল তারা।

উড়ে চলছে তো চলছেই, দেখে — যাচ্ছে একজন ভালোমানুষ: একটা

পা কানের সঙ্গে বাঁধা, অন্য পায়ে চলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। বোকা ফের চেঁচিয়ে উঠল:

'কুশল হোক গো ভালোমানুষ! এক পায়ে লাফিয়ে চলছেন কেন?'

লোকটা বললে, 'এক পায়ে লাফিয়ে যাচ্ছি কেননা অন্য পা'টার বাঁধন খুলে দিলে আমি এক কদমেই সারা দুনিয়া পেরিয়ে যাব। সেটা আমি চাই না।'

'কিন্তু যাচ্ছেন কোথায়?'

'রাজবাড়িতে ভোজ খেতে।'

'উঠে বসুন আমাদের সঙ্গে।'

'সে তো ভালোই!'

উঠে বসল, ফের উড়ল তারা।

উড়ছে তো উড়ছেই, দেখে — এক ধনুর্ধর ধনুক বাগিয়ে তাগ করছে, কিন্তু কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না: না একটা পাখি, না একটা জন্তু — কেবল শূন্যি মাঠ।

'কুশল হোক গো ভালোমানুষ। কোথায় আপনি তাক করছেন! পশুপক্ষী কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।'

'দেখা যাচ্ছে না মানে? তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি।'

'কী আপনি দেখছেন?'

'ওই-যে! ওই বনটার ওপাশে একশ' ক্রোশ দূরে ওকগাছে বসে আছে ঈগল।'

'উঠে বসুন আমাদের সঙ্গে।'

বসল সে, আবার উড়ল জাহাজ। উড়ছে তো উড়ছেই, দেখে — রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এক বুড়ো, পুরো এক বস্তা ময়দা নিয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় আপনার যাবার অত তাড়া দাদু?'

বলে, 'যাচ্ছি দুপুরের খাবার জন্যে ময়দা আনতে।'

'আপনার তো এমনিতেই রয়েছে পুরো এক বস্তা।'

'ওতে ময়দা আর কত! আমার এক গেরাসও হবে না।'

'উঠে বসুন আমাদের সঙ্গে!'

বুড়োকেও নেওয়া হল। আবার উড়তে লাগল জাহাজ।

দেখে — সায়রের কাছে কে একজন বুড়ো, কী যেন খুঁজছে।

'আপনি ওখানে ঘুরঘুর করছেন কেন দাদু?' চিৎকার করল বোকা।

বুড়ো বলে, 'তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু জল কোথাও দেখছি না।'

'আপনার সামনে তো গোটা একটা সায়র, খাচ্ছেন না কেন?'

'এ্যা, কত আর জল ওতে! আমার এক ঢোকও হবে না।'

'তাহলে আসুন আমাদের সঙ্গে!'

উঠে বসল বুড়ো, আরো উড়ে চলল তারা। আরো এক বুড়োর সঙ্গে দেখা, এক বস্তা খড় নিয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের দিকে।

'কুশল হোক দাদু! খড় নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?'

'গাঁয়ে।'

'বলেন কী! গাঁয়ে কি খড়ও নেই?'

বলে, 'এগুলো তেমন খড় নয়!'

'তাহলে কেমন খড়?'

'এ যা খড়, যত গরমই পড়ুক, রোদে যতই পোড়াক, খড় ছড়িয়ে দিতেই অমনি হিম নামবে, তুষারপাত হবে।'

বোকা বললে, 'তা উঠে বসুন আমাদের সঙ্গে, রাজবাড়ি যাব।'

'সে মন্দ কি, যাওয়া যাক।'

উঠে বসল, চলল উড়ে।

উড়ে চলল কত দিন কে জানে, এসে পৌঁছল রাজপুরীর ভোজে।

আঙিনার মাঝখানটিতে সেখানে টেবিল পাতা, তাতে নানারকমের খাবারদাবার: আগুনে ঝলসানো ষাঁড়, যতরকমের পাখি-পাখালির কাবাব, মাংসের পুর দেওয়া নাড়ি, দুধে সেদ্ধ মন্ড, সব একেবারে ডাঁই করা, পিপের পর পিপে বিয়ার — খাও, দাও, প্রাণ যত চায়! লোক এসেছে আধেক রাজ্য ভেঙে — ছেলে বুড়ো, হোমরা-চোমরা, ধনী দরিদ্র কে নেই! বুদ্ধিমান দাদারাও বসে আছে সেখানে।

এখন, সোনার জাহাজে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বোকা তো এল উড়ে, নামল রাজার জানলার নিচে। জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে খেতে গেল তারা।

রাজা দেখল, সোনার জাহাজে উড়ে এসেছে মামুলি চাষাভুষো একটা লোক, কামিজে তালির পর তালি, জরাজীর্ণ আটপৌরে তার প্যান্ট, পায়ে বুটজুতোর তো বালাই-ই নেই।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রাজা:

'নিজের মেয়ের বিয়ে দেব আমি এই ছোঁড়াটার সঙ্গে? হতেই পারে না।'

ভাবতে শুরু করল কী করে রেহাই পাওয়া যায়। চাকরকে ডেকে হুকুম দিলে:

'ছোঁড়াটাকে গিয়ে বলবি: সোনার জাহাজে উড়ে এলেও আমার মেয়ের সে মুখদর্শনও করতে পারবে না যদি না অতিথিদের খাওয়া শেষ হতে না হতে সে জীয়ন জল না নিয়ে আসতে পারে। আর সে জল আনতে না পারলে — তরোয়াল কষে, মুণ্ডু যাবে খসে।'

গেল চাকর।

ওদিকে তুখোর-কান লোকটা শুনতে পেয়েছিল রাজা কী বলছে, বোকাকে সেকথা জানিয়ে দিল সে। দমে গেল বোকা: খায় না, দায় না, মাথা নুইয়ে বসেই থাকে বেঞ্চিতে।

রণপেয়ে শুধায়:

'হঠাৎ মুষড়ে পড়লে কেন হে?'

'রাজা আমায় এক কাজ দিতে চায়: অতিথিদের খাওয়া শেষ হতে না হতে আমি যেন জীয়ন জল নিয়ে আসি। আনি কেমন করে?'

'দুঃখু করো না, আমি নিয়ে আসব।'

'তা পারলে দ্যাখো।'

রাজার হুকুম নিয়ে এল চাকর। বোকাটা এদিকে সবই জানে।

বললে, 'জানাও গিয়ে যে এনে দেব।'

রণপেয়ে কান থেকে তার পাটা খুলল, এক কদমেই পেঁৗছে গেল জীয়ন জলে। জল নেওয়ার পর ক্লান্ত লাগল তার।

ভাবলে, 'ওরা যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া করছে, আমি ততক্ষণ ঐ ঝোপের কাছে বসে একটু জিরিয়ে নিই।'

বসতেই ঘুমিয়ে পড়ল। রাজপুরীতে ভোজ ওদিকে শেষ হতে চলেছে, অথচ রণপেয়ের পাত্তা নেই। বোকা বসে আছে আধমরা হয়ে। ভাবছে, 'গেলাম এবার।' তুখোর-কান মাটিতে কান পেতে শুনতে লাগল। শুনে শুনে শেষে বললে:

'ভাবনা নেই, ওই ওটা এখন ঘুমচ্ছে ঝোপের কাছে।'

'কী করি এখন?' জিগ্যেস করে বোকা, 'ওকে জাগানো যায় কেমন করে?'

তীরন্দাজ বললে:

'ভয় নেই, এক্ষুনি ওকে জাগিয়ে দিচ্ছি।'

ধনুক টেনে সে তীর ছুঁড়ল। ঝোপের ডালপালা খচমচ করে আঁচড়ে দিল রণপেয়েকে। ধড়মড়িয়ে উঠে সে কদম ফেলল — অতিথিদের খাওয়া তখনো শেষ হয় নি, জীয়ন জল নিয়ে সে হাজির।

অবাক হল রাজা, কিন্তু কিছুই বললে না।

চাকরকে হুকুম করলে: 'ছোঁড়াটাকে গিয়ে বল, বন্ধুদের সঙ্গে এক গ্রাসে

যদি সে বারো জোড়া ঝলসানো ষাঁড় আর বারো চুল্লি রুটি খেয়ে ফেলতে পারে, তাহলে তাকে মেয়ে দেব। না পারলে — তরোয়াল কষে, মুণ্ডু যাবে খসে!'

কানে গেল তুখোর-কানের, বোকাকে সব বললে।

'কী করি এখন? গোটা একখান রুটিও যে আমি এক গ্রাসে খেতে পারব না!' বললে বোকাটা।

ফের মাথা তার নুয়ে পড়ল, মুখ আঁধার।

কানে গেল সর্বভুকের:

'দুঃখু ক'রো না বন্ধু। আমি তোমাদের সকলের হয়ে সবই খেয়ে নেব, পেট তবুও খালি থেকে যাবে।'

এল চাকর, বোকা তাকে বললে:

'জানি, জানি রাজার হুকুম। বলো গিয়ে খাবার তৈরি করতে।'

ঝলসানো হল বারো জোড়া ষাঁড়, সেঁকা হল বারো চুল্লি রুটি। সর্বভুক গিলতে শুরু করেই চেটেপুটে সব শেষ করে দিল, আরো খেতে চায়।

বলে, 'এহ্, পেট ভরল না। আরো অতটা হলেও নয় হয়।'

রেগে উঠল রাজা। ফের হুকুম দিলে: বারো পিপে বিয়ার আর বারো পিপে মদ এক চুমুকে শেষ করতে হবে।

'শেষ করতে না পারলে — তরোয়াল কষে, মুণ্ডু যাবে খসে।'

তুখোর-কান শুনতে পেল হুকুম, বোকাকে সব বললে। এবার তখন সর্বপায়ী বললে:

'যাক গে বন্ধু, দুঃখু করো না। আমিই সব খেয়ে নেব, তেষ্টা তবু রয়েই যাবে।'

বারো পিপে বিয়ার আর বারো পিপে মদ ঢেলে দেওয়া হল। চুমুক দিল সর্বপায়ী, শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত শুষে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'রাজ ভোজনে বড়ো টানাটানি, কম পড়ল। আরো অতটা পেলেও হত।'

রাজা দেখে, ব্যাপার সুবিধের নয়, ভাবল, 'বোকাটার ভবলীলাই সাঙ্গ করতে হয়।'

ফের ডেকে পাঠাল চাকরকে:

'যা, গিয়ে বল গে যে বিয়ের আগে যেন স্নান করে নেয়।'

আর লোহার স্নানঘরকে তাতিয়ে লাল টকটকে করে তোলার হুকুম দিলে। তার কাছে ঘেঁষাই চলে না, গা ধোওয়া তো দূরের কথা।

বলা হল বোকাটাকে। সে চলল গোসলখানায়, তার আগে আগে নিজের খড় নিয়ে যায় হিমদাদু। গেল তারা গোসলখানার কাছে, ঘর একেবারে তেতে আগুন, প্রাণ যায় যায়, খড় ছড়িয়ে দিল হিমদাদু, অমনি এমন ঠাণ্ডা যে বোকাকে জোর করে স্নান সারতে হল; গা গরম করে নিতে লাগল চুল্লির ওপর উঠে।

চাকরকে পাঠাল রাজা, ভেবেছিল, বোকাটার কিছু ছাই পড়ে থাকবে বোধ হয়। বোকা ওদিকে চুল্লির ওপরকার মাচায় জিরিয়ে নিচ্ছে:

'রাজার গোসলখানাটা বড়ো বাজে। এত ঠাণ্ডা যেন সারা শীতকাল ওতে আঁচ পড়ে নি।

রাজা তো ঘাবড়িয়ে গেল। তাহলেও কী করা যায় ওকে নিয়ে?

ভাবতে লাগল রাজা। ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত বললে:

'পাশের রাজা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে যাচ্ছে। পাণিপ্রার্থীদের আমি পরখ করতে চাই। তাকেই কন্যা সম্প্রদান করব যে সবচেয়ে নির্ভীক বীরব্রতী বলে প্রমাণ দেবে।'

লড়াইয়ের জন্যে জমা হল অনেক বীরব্রতী। দাদারাও এসেছে নিজেদের ঘোড়ায় চেপে। বোকাটার ওদিকে ঘোড়াটাও নেই। রাজার আস্তাবল থেকে একটা বুড়ি-থুত্থুড়ি বেঁড়ে মাদি ঘোড়া চেয়ে নিল বোকা। চলতেও পারে

না। সব বীরব্রতী বহু আগেই ওকে ছাড়িয়ে ছুটে গেছে, ও কেবল খুট খুট — নড়েও না জায়গা থেকে।

বন থেকে বেরিয়ে এল থুত্থুড়ে বুড়ো, যে তাকে উড়ন্ত জাহাজ পেতে সাহায্য করেছিল।

বললে, 'দুঃখু করো না বাছা, আমি তোমায় সাহায্য করব। বড়ো বনটা দিয়ে যাবে, ডানদিকে দেখতে পাবে ঝাঁকড়া এক লাইম গাছ। তুমি বলবে, 'লাইম গাছ, ও লাইম গাছ, পথ দাও।' লাইম পথ ছেড়ে দেবে, তা থেকে বেরিয়ে আসবে লাগাম পরা ঘোড়া, জিনের সঙ্গে বাঁধা থাকবে থলি। সাহায্যের দরকার হলে তুমি বলবে, 'থলে থেকে বেরিয়ে এসো।' দেখবে তখন কী হয়। এখন চললাম।'

খুশি হয়ে উঠল বোকা, নেমে পড়ল বেঁড়ে মাদি ঘোড়াটা থেকে, ওকে নিয়ে কেবল ঝামেলাই! দৌড়ে ঢুকল বনে। পেল সেই লাইম গাছটা।

'লাইম গাছ, ও লাইম গাছ, পথ দাও!'

পথ ছেড়ে দিল লাইম গাছ। তা থেকে বেরিয়ে এল অপরূপ এক ঘোড়া, সোনারঙা কেশর, আগুনের মতো ধকধক করছে বল্গা। জিনের ওপর বর্ম, আর তার সঙ্গে বাঁধা একটা থলি।

বর্ম পরে বোকা হাঁক দিল:

'ওহে, বেরিয়ে এসো থলে থেকে।'

হঠাৎ অমনি থলে থেকে বেরিয়ে এল সৈন্যদল, — তার গোণা নেই, গুনতি নেই।

ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠল বোকা, সৈন্যদের পেছনে নিয়ে ছুটে গেল শত্রুদের দিকে।

শিগগিরই মুখোমুখি হল শত্রুদের, নিজের সেনা সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ল তাদের ওপর। এমন তরোয়াল চালাতে লাগল যে হেরে গেল সবাই। কেবল শেষের দিকে সে জখম হল পায়ে।

এই সময় রাজা আর রাজকন্যে এসেছিল যুদ্ধ দেখতে। রাজকন্যে দেখে নির্ভীক বীরব্রতী আহত। নিজের রুমাল আধাআধি ছিঁড়ে আধখানা নিজের কাছে রেখে বাকি আধখানা দিয়ে জখম তার বেঁধে দিল।

শেষ হল লড়াই, বোকা এল বনে, লাইম গাছের কাছে।

'লাইম গাছ, ও লাইম গাছ, পথ দাও!'

পথ ছেড়ে দিল লাইম গাছ। সবকিছু লুকিয়ে রাখল সে — ঘোড়া, থলি, বর্ম। নিজে সে আবার পরল তার তালিমারা কামিজ আর জরাজীর্ণ প্যাণ্ট।

রাজা ওদিকে বিজয়ীকে তলব করে নিজের কাছে। দিকে দিকে ছুটল হরকরারা, খোঁজে সেই বীরকে জখম পায়ে যার রাজকন্যের রুমাল বাঁধা। তেমন কাউকে আর পাওয়া যায় না। তখন রাজা হুকুম দিলে শুধু ধনীদের মধ্যে নয়, খুঁজে দেখো সমস্ত প্রজাদের। সমস্ত দীনদরিদ্র কুটিরে যেতে থাকল চাকরবাকরেরা। অনেকদিন তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত রাজার দু'জন নোকর পেঁছিল শহরের একেবারে শেষের এক কুটিরে। দাদারা তখন খেতে বসেছিল, বোকা চাপাটি বানাচ্ছিল তাদের জন্যে। একটা পায়ে তার রাজকন্যের রুমাল বাঁধা। রাজার লোকেরা তক্ষুনি তাকে নিয়ে যেতে চায় প্রাসাদে।

ও কিন্তু মিনতি করে:

'ভাইয়েরা, এমন উশকো-খুশকো চেহারা নিয়ে রাজার কাছে যাই কেমন ক'রে! আমায় অন্তত স্নান করতে যেতে দাও একবারটি। আমি আসতে আসতে তোমরা একটু খেয়ে দেয়ে নাও।

'ঠিক আছে, কেবল গা ধুয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

নিজেরা বসল টেবিলে, চাপাটি খায় গাল ভরে। বোকা ওদিকে ছুটে গেল বনে। এল লাইম গাছের কাছে:

'লাইম গাছ, ও লাইম গাছ, পথ দাও!'

পথ ছেড়ে দিল লাইম গাছ, লাফিয়ে এল ঘোড়া। পোশাক বদলাতেই বোকা হয়ে উঠল এমন রূপবান দর্শনধারী যে চোখ ফেরানো যায় না। ঘোড়ায় চেপে গেল সে রাজার কাছে।

রাজা আর রাজকন্যের আনন্দ ধরে না, সমাদরে তারা বরণ করল বীরব্রতীকে, তক্ষুনি শুরু হল বিয়ের আয়োজন।

চাষির-পো ইভান

অনেক কাল আগে ছিল এক রাজা আর রানী।

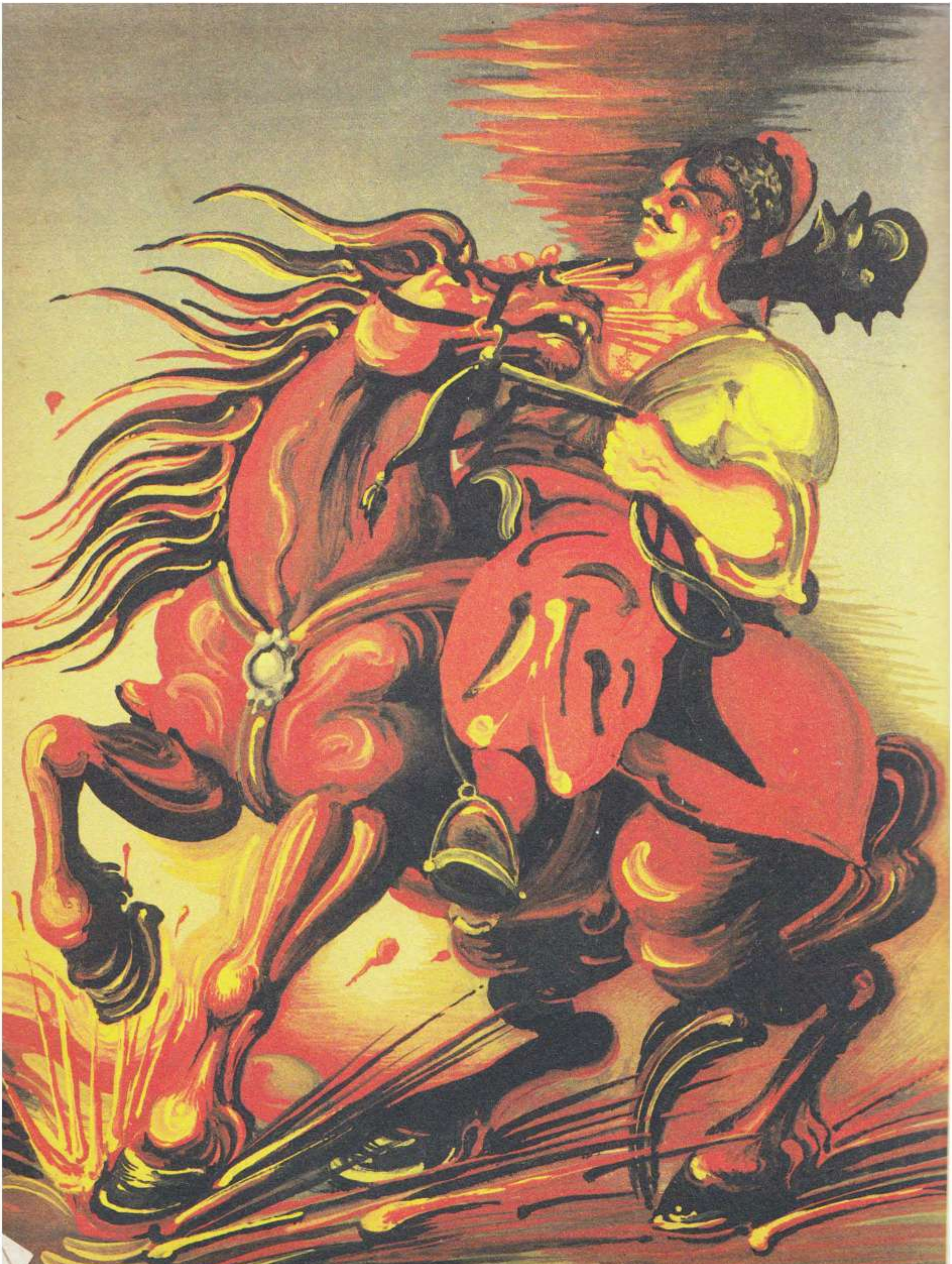
বয়সকালে তাদেরে ছেলেপুলে হয় নি, তবে বুড়ো বয়সে হল একটি ছেলে। তাকে দেখে দেখে আর আনন্দ ধরে না।

যখন সে বড়ো হয়ে উঠল, ঠিক করল তার বিয়ে দেবে। ছেলে কিন্তু বলে:

'যতদিন না আমায় এমন একটা ঘোড়া দিচ্ছ যা আগুন খায়, শিখায় চুমুক দেয়, ছুটলে বিশ যোজন অবধি মাটি কাঁপে, ওকগাছের পাতা ঝরে পড়ে, ততদিন বিয়ে করব না।'

রাজা তার মহাবীরদের ডেকে জিগ্যেস করতে লাগল:

'হয়ত তোমাদের কেউ জানো, কেউ শুনেছ কোথায় এমন ঘোড়া যা আগুন খায়, শিখায় চুমুক দেয়, ছুটলে বিশ যোজন অবধি মাটি কাঁপে, ওকগাছের পাতা ঝরে পড়ে?'



সবাই বললে কেউ তা দেখে নি, কেউ শোনে নি, তেমন ঘোড়া এনে দিতে পারবে না...

তখন রাজা সারা দেশে খত পাঠাল:

'তেমন ঘোড়ার কথা কেউ হয়ত শুনেছে, কিংবা নিজেই সে তা খুঁজে পাবে, তাহলে আসুক সে আমার কাছে।'

এমন একটা খত পেঁছিল কোন একটা মুলুকে, পড়ল তা চাষিরা, তাদের একজন বাড়ি এসে বৌকে বললে:

'এই রকম একটা খত এসেছে আমাদের মুলুকে... এমন বীরকুমার থাকলে তাকে জারের কাছে যাবার হুকুম হয়েছে।'

এখন এই চাষির ছিল এক ছেলে, সে বলে:

'আমি কিন্তু জানি কোথায় তেমন ঘোড়া!'

বাপ রেগে উঠল:

'রাখ বাপু তোর যত বাজে কথা! বাড়ির বাইরে গেলেই পাড়ার ছেলেরা তোকে পিটোয়, সেই তুই কিনা আবার এমন ঘোড়ার বড়াই করিস!'

ছেলে তখন কাপড়চোপড় এঁটে বললে:

'চলো বাবা আঙিনায়!'

গেল তারা।

ছেলে এক হাতে একটা ওকগাছ ধরেই নুইয়ে আনল মাটিতে, তারপর ছেড়ে দিল।

চোখ বড়ো বড়ো করে দাঁড়িয়ে রইল বাবা, ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে।

বললে, 'হ্যাঁ, এখন বাছা বিশ্বাস হচ্ছে।'

গেল সদরে, ছেলেকে বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকল, বললে:

'আজ্ঞা করুন মশাইরা, কিছু কথা বলি।'

'বলতে চাও, তা বলো।'

'আমার এক ছেলে আছে, তেমন ঘোড়া সে জোগাড় করতে পারে...'

সবার তখন কী চোটপাট:

'অমুক-তমুক, গারদে পোরা উচিত! কী ওর ছেলের মুরোদ? বাড়ির বাইরে গেলেই পাড়ার ছেলেরা তাকে পিটোয়।'

তাই ওকে আর ছেলেকে গারদেই ঢোকানো হল। গারদেই বসে আছে ওরা, শেষে এলাকার কর্তা বললে:

'ওরা যদি রাজার কাছে মিথ্যে বলে, তাহলে আমাদের মনে হয় কিছু হবে না।'

ছেড়ে দিলে ওদের, নিজেরাই খবর পাঠাল রাজার কাছে। খবরটা পড়ে রাজার বিশ্বাসই হল না যে চাষির-পো অমন কাণ্ড করতে পারে, তাহলেও তার জন্যে গাড়ি আর চাকরবাকর পাঠাল।

ছেলেটাকে নিয়ে আসা হল রাজার কাছে। আসতেই রাজা শুধোয়:

'এমন ঘোড়া আনতে পারবে?'

'পারব।'

'তার জন্যে কী তোমার চাই?'

'আমার দরকার একটা তাগড়াই ঘোড়া আর একটা ভারি মুগুর।'

রাজা তার অশ্বপালকে একটা চিরকুট লিখে দিল।

'মাঠে চলে যাও, অশ্বপাল আছে সেখানে, চিরকুটটা তাকে দিলে সে ঘোড়া দেবে তোমায়।'

ছেলে গেল, অশ্বপালকে দেখাল চিরকুটটা।

অশ্বপাল বললে:

'একটু দাঁড়াও, ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যাব, তখন যেটা পছন্দ হবে সেটাই নিও।'

বাছতে লাগল ছেলেটা, যেটারই লেজ চেপে ধরে লেজ থেকে যায় হাতে; কেশর চেপে ধরে, কেশর আর থাকে না। বিশটা ঘোড়ার চামড়া ছাড়াল, কিন্তু ঘোড়া আর পছন্দ হল না।

বাড়ি ফেরার পথে দেখে একেবারে দীনদরিদ্র এক কুটির। চাল তার ফুটো-ফুটো; ওদিকে আকাশে ঠিক তখনই কালো মেঘ ঘনাচ্ছে, কুঁড়ের কাছে বসে আছে এক বুড়ি।

দেখে — আসছে এক সুজন। বললে:

'আমায় একটু সাহায্য করো সুজন, কেউ এই অভাগিনীকে দেখে না।'

ঘোড়ার গা থেকে যেসব ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছিল, সেগুলো দিয়ে কুঁড়ের চাল ঢেকে দিল সে, জল যেন আর চুইয়ে না পড়ে। বুড়ি তাকে ধন্য ধন্য করলে, সেও এগিয়ে চলল।

রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে অবাক, ছেলেটা পছন্দমতো কোনো ঘোড়া খুঁজে পায় নি।

'আমার আস্তাবলে যাও চাষির-পো ইভান, নিজের ঘোড়া খুঁজে নাও। হয়ত পাবে সেখানে।'

গেল সে, কিন্তু যে ঘোড়ার গায়েই হাত দেয়, লুটিয়ে পড়ে সেটা। ঘোড়া পাওয়া গেল না।

রাত নামল, ইভান বেরিয়ে এল স্তেপে। পালোয়ানি একটা শিস দিতেই মুহূর্তে ছুটে এল ঘোড়া:

'কেন গো কর্তা আমায় দরকার?'

'আমাদের এবার যাত্রা করার সময় হয়েছে।'

'ঠিক আছে।'

ঘোড়াটাকে সে রাজার আস্তাবলে নিয়ে এল, ভেঙে পড়ল সমস্ত দেয়াল। তাকে বেঁধে বাসন্তী গম খেতে দিয়ে নিজে ঘুমতে গেল।

সকালে উঠল রাজা, হুকুম দিলে চাষির-পো ইভানকে জিগ্যেস করা হোক স্বপ্নে সে কোনো ঘোড়া দেখেছে কিনা।

সে ওদিকে বলে:

'ঘোড়া আমি পেয়ে গেছি, আস্তাবলে রয়েছে...'

গেল সবাই দেখতে। কী প্রকান্ড ঘোড়া — রাজা তো ভয়ই পেয়ে গেল।

'এবার আমার মুগুর বানিয়ে দু'জোড়া বলদ দিয়ে সেটা টেনে আনান বন থেকে।'

তাও নিয়ে আসা হল।

সেটাকে সে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে ঘুমতে গেল দেড় দিন দেড় রাতের জন্যে।

যখন ঘুম ভাঙল — মুগুর উড়ে আসছে। কড়ে আঙুলটা বাড়িয়ে ধরল সে।

মুগুর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

বললে, 'চার জোড়া বলদে করে মুগুর আনান। এটায় চলবে না।'

কাটা হল একশ' বছরের বুড়ো ওকগাছ, নিয়ে আসা হল চার জোড়া বলদে করে...

ইভান সেটা আকাশে ছুড়ে দিয়ে ঘুমতে গেল তিন দিন, তিন রাতের জন্যে।

ঘুম ভেঙে শোনে গোঁ-গোঁ করে উড়ে আসছে মুগুর। মাঝের আঙুলটা বাড়িয়ে ধরল সে, মুগুর তাতে ধাক্কা খেয়ে সাত হাত ডুবে গেল মাটির মধ্যে।

বললে, 'তা এটা মন্দ হবে না।'

রওনা দেবার জন্যে তৈরি হতে লাগল সে। রাজা তখন শুধোয়:

'তা তেমন ঘোড়া যদি আনো, যে পুরস্কার চাও তাই পাবে, কখনো দুঃখু দেব না তোমায়। কথার আমার নড়চড় নেই।'

চলে গেল ইভান, কিন্তু রাজার এখনো বিশ্বাস হয় না যে কোন এক চাষির-পো ইভান নাকি তেমন ঘোড়া এনে দিতে পারবে।

তার পেছনে পাঠাল নিজের মহাবীরদের, যাদের গায়ে চাষাড়ে নয়, বনেদি রক্ত।

রাজা তাদের বললে:

'সঙ্গ ধরো ওর।'

চাষির-পো ইভান শোনে — মাটি দুরদুর করছে।

ভাবলে, 'হয় নাগ উড়ে আসছে, নয় কিসব মহাবীর।'

তারা এসে কুশল জানাল। ইভান শুধোয়:

'কে আপনারা?'

'রাজা আমাদের পাঠিয়েছে তোমার সঙ্গে থাকতে।'

'কী করা যায় তাহলে? আমাদের একজন মুখিয়া দরকার। মুখিয়া ছাড়া কোনো নিয়মশৃঙ্খলা থাকবে না। কোনো একজনকে মেনে চলতে হবে।'

বনেদি রক্তের মহাবীরেরা তো অমনি হৈচৈ করে উঠল:

'আমি হব মুখিয়া, আমি হব মুখিয়া...'

চাষির-পো ইভান তখন বললে:

'উঁহু, এভাবে চলবে না। এসো, মুগুর ছোঁড়া যাক। যে বেশি দূরে ছুঁড়তে পারবে, সেই হবে মুখিয়া।'

তাই মুগুর ছুঁড়ল একজন...

একদিন গেল, দু'দিন গেল, মুগুর নেই। তিন দিনের দিন দেখা গেল মুগুরটা। ছুড়ল দ্বিতীয় জন...

একদিন গেল তিনদিন গেল, মুগুর নেই...

পাওয়া গেল কেবল এক সপ্তাহ পরে। মুগুর ছুড়ল চাষির-পো ইভান...

গেল এক সপ্তাহ, নেই মুগুর, গেল দ্বিতীয়, তৃতীয় সপ্তাহ, তবুও মুগুরের পাত্তা নেই...

'আমরা বোধ হয় তোমার মুগুরকে অনেক আগেই ফেলে এসেছি...'

'হতে পারে না, নিশ্চয় কারো হাতে পড়েছে।'

গেল আরো এক সপ্তাহ।

দেখে: বেড়া পেরিয়ে মুগুর পড়েছে ভেতরে, পুরীর একটা কোন ঢোকার পথ তামার সেতু বেয়ে।

দেখে: বেড়া পেরিয়ে মুগুর পড়েছে ভেতরে, পুরীর একটা কোন গুঁড়িয়ে দিয়ে।

এখন, সেখানে থাকত ভয়ংকর সব নাগেরা। কেবল তখন পুরীতে কেউ ছিল না, দূরে কোথায় যেন তারা লড়ছে।

চাষির-পো ইভান তখন বনেদি রক্তের মহাবীরদের বললে:

'আজ তুমি সেতু পাহারা দেবে আর তুমি শোবে ঘোড়াগুলোর কাছে। আমি ঘুমাব বাড়ির ভেতরে।' আর যে সেতু পাহারা দেবে, তাকে হুকুম করল:

'দেখো ভায়া, ঘুমিও না, পাহারা দিও...'

সে লোকটা তো টহল দেয়, দেয়, কিন্তু আর পারে না, বড়োই ক্লান্ত হয়েছিল এতটা পথ আসতে, ঘুমিয়ে পড়ল সেতুর ওপর। ওদিকে চাষির-পো ইভানের ঘুম ভেঙে গেল, দেখে দুপুর রাত। বেরতে হয়। সাজ-পোশাক এ'টে এল সেতুতে, পাহারাদার ওদিকে ঘুমচ্ছে।

মাটি কে'পে উঠল, উড়ে আসছে ষষ্ঠমুণ্ড নাগ, নিজের ঘোড়াটাকে বলছে:

'দাঁড়িয়ে থাক, ঘোঁৎঘোঁৎ করিস না, আমাদের সঙ্গে লড়ার মতো কোনো শক্তি নেই। আছে কেবল চাষির-পো ইভান, তবে দাঁড়কাকে তার হাড়গোড়ও এখানে এনে ফেলতে পারবে না। তাছাড়া এখনো সে ছেলেমানুষ।'

'দাঁড়কাক হাড়গোড় আনবে কেন, সুজন কুমার নিজেই আসে,' বললে চাষির-পো ইভান।

নাগ তাকে দেখে শুধাল:

'এসেছ লড়তে নাকি ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতাতে?'

'ভাই-ভাই সম্পর্ক নয়, লড়তে এলাম।'

'তাহলে,' নাগ বললে, 'তুমি মারো প্রথম।'

চাষির-পো ইভান বললে, 'না, তুমিই মারো। তোমার গোটা রাজ্যে তুমিই মুখিয়া।'

ষষ্ঠমুণ্ড নাগ কী মার মারলে, কিন্তু চাষির-পো ইভানকে শুধু খানিকটা ঠেলে দিতে পারল জায়গা থেকে আর ইভান নাগের ওপর মুগুর চালাতেই ছয় মুণ্ডই খসে পড়ল।

সেতুতে যে পাহারায় ছিল, সকালে তাকে সে জিগ্যেস করে:

'তা কী, ভালো করে পাহারা দিয়েছিলে তো?'

সে বললে, 'হ্যাঁ, ভালো করে। একটা পাখিও সেতুর ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে নি।'

পরের রাতে ইভান দ্বিতীয় বীরকে রাখল সেতুর পাহারায়, প্রথম জনকে আস্তাবলে।

সেও ঘুমিয়ে পড়ল...

চাষির-পো ইভান ভাবল, এখন বেরতে হয়।

গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেতুর কাছে। শোনে — মাটি গুরু গুরু করছে... উড়ে আসছে নবমুণ্ড নাগ।

নিজের ঘোড়াটাকে সে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাক, ঘোঁৎঘোঁৎ করিস না। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো কোনো শক্তি নেই গোটা রাজ্যে। আছে কেবল চাষির-পো ইভান। কিন্তু দাঁড়কাকে ওর হাড়গোড়ও এখানে এনে ফেলতে পারবে না...'

চাষির-পো ইভান বললে:

'বাজে বকছ! সুজন কুমার নিজেই আসে!'

'এলে লড়তে নাকি ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতাতে।'

'সুজন কুমার আসে তোমার সঙ্গে ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতাতে নয়, লড়তে।'

'বেশ, মারো তুমি!'

'না, তুমি মারবে আগে, অর্ধেক দুনিয়ায় তুমিই মুখিয়া।'

কী মার মারলে নবমুণ্ড নাগ — চাষির-পো ইভানের গোড়ালি পর্যন্ত মাটিতে ডুবে গেল।

কিন্তু যেই মারল ইভান, অমনি খসে পড়ল সাতটা মুণ্ডুই। দ্বিতীয় মারে শেষ দুটো মুণ্ডুও গেল...

বাড়ি ফিরল চাষির-পো ইভান, যে সেতু পাহারায় ছিল, সকালে জিগ্যেস করল তাকে:

'তা কী, ভালো করে সেতু পাহারা দিয়েছিলে তো?'

'এমন পাহারা দিয়েছি যে একটা ইঁদুরও আমার পাশ কাটিয়ে যেতে পারে নি...'

পরের দিন রাতে সে দুই মহাবীরকে ডেকে দেয়ালে নিজের দস্তানা টাঙিয়ে রেখে বললে:

'আজ ভায়ারা আমি নিজেই সেতু পাহারা দেব, আর তোমরা আমার দস্তানাটায় নজর রাখবে: যদি দেখ তা থেকে ঘাম ঝরছে,

তাহলে নিশ্চিন্তে বসে থেকো, যদি রক্ত — তাহলে ছেড়ে দিও আমার ঘোড়াটাকে।'

সেতুর কাছে যখন সে গেল, তখন মাঝ রাতও হয় নি; দেখে বিশ যোজন ধরে মাটি কাঁপছে, ঝরে পড়ছে ওকগাছের পাতা।

এবার উড়ে আসছে বড়ো নাগ, সেই ঘোড়াটায় যা আগুন খায়, শিখায় চুমুক দেয়।

উড়ে এসে সে তার ঘোড়াকে বললে:

'দাঁড়িয়ে থাক, হোঁচট খাস নি। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো কোনো শক্তি নেই সারা দুনিয়ায়। আছে কেবল চাষির-পো ইভান, কিন্তু এখনো সে ছেলেমানুষ, এখন তার কাজ কেবল চুল্লির ওপরকার মাচাতে খানিক গড়িয়ে নেওয়া। এখানে সে আসবে না, এখানে তার হাড়গোড়ও নিয়ে আসতে পারবে না দাঁড়কাক।'

চাষির-পো ইভান তখন বলে উঠল:

'দাঁড়কাক হাড়গোড় আনবে কেন, সুজন কুমার নিজেই আসে।'

'তা বেশ, তবে লড়ব নাকি ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতাব?'

'সুজন কুমার আসে তোমার সঙ্গে ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতাতে নয়, লড়তে।'

'মারো,' নাগ বললে।

'না, তুমি মারো আগে — সারা দুনিয়ায় তুমিই সবচেয়ে বলবান।'

কী মার মারলে নাগ, চাষির-পো ইভান একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেল।

চলল দু'জনের মারামারি, চলতেই থাকল...

নাগের বারো মুণ্ডুর মধ্যে রইল কেবল তিনটে, আর চাষির-পো ইভান

একেবারে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল মাটিতে, একেবারে নেতিয়ে পড়ে আর-কি।

নাগ বললে, 'আচ্ছা, বাপ ছিল তোমার?'

'ছিল।'

'তার বলদ ছিল?'

'ছিল।'

'বলদ হালে জুতত?'

'জুতত।'

'তাদের জিরিয়ে নিতে দিত?'

'দিত।'

'তাহলে আমরাও খানিক জিরিয়ে নিই।'

বিশ্রাম নিতে গিয়ে চাষির-পো ইভান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুগুরটা ঠেলে দিতেই সেটা গিয়ে পড়ল আস্তাবলে, ভেঙে পড়ল আস্তাবল। তার ঘোড়াও অমনি ছুটে বেরিয়ে এল তার কাছে, মাটি খুঁড়তে লাগল তার ক্ষুর দিয়ে...

ওদিকে ঘুম ভেঙে গেল মহাবীরদের, দেখে, দস্তানা থেকে বেশ রক্ত ঝরছে, কিন্তু চাষির-পো ইভানের উদ্ধারে যেতে ভয় পেল তারা। ভাবল, 'ওর জন্যে নিজেদের মাথা পেতে দিয়ে কী হবে?'

ততক্ষণে ওদিকে ইভানের চারপাশের মাটি খুঁড়ে ফেলেছে তার ঘোড়া, চাষির-পো ইভান তখন নাগকে বললে:

'এইবার আমি তোমায় খুন করব।'

'বেশ মারো, তবে মরার আগে এই কথাটা তোমায় বলে যাই: এই যে ঘোড়াটা রাজার দরকার, সেটা আমার কাছ থেকে নিলেও তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না: আমার আছে আরো তিন বোন, আর মা আর বাবা —

মহারাজ ইরদ*। যতই করো, ওরা তোমায় আর ঐ দুই মহাবীরকে ধরাধাম থেকে বিদায় দেবে।'

নাগের শেষ মুণ্ডু কেটে ফেলল ইভান, কিন্তু নিজে ভাবনায় পড়ল।

এইসময় যে বুড়ির কুঁড়ের চাল ইভান ঘোড়ার চামড়া দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল, সেই বুড়ি টের পেল যে ইভানের বিপদ ঘনিয়েছে — দুনিয়ায় যাই ঘটুক, সবই জানতে পারত সে।

নিজের কুকুরকে সে পাঠাল ইভানের কাছে। কুকুর তাকে বললে:

'যখন বাড়ি যাবে, পথে তোমাদের খুব তেষ্টা পাবে, গলা শুকিয়ে কাঠ। ডান দিকে থাকবে সায়র, জল তার কাচের মতো ঝকঝকে পরিষ্কার, কিন্তু খেয়ো না। মুগুর দিয়ে বাড়ি মারবে তাতে, দেখো কী হয়। আরো এগিয়ে যাবে, দেখতে পাবে ডুমুর গাছ, তার তলে টেবিল পাতা, তাতে নানারকমের খাবারদাবার... খিদে পাবে তোমাদের, কিন্তু খেয়ো না। মুগুর দিয়ে বাড়ি মেরো, দেখো কী হয়। আরো এগিয়ে গিয়ে দেখবে ডুমুর গাছ, তার তলে বিছানা। ঘুম পাবে, কিন্তু শোবে না। মুগুরের বাড়ি মারবে, দেখবে কী হয়।'

ইভান সব শুনে বুড়ির কুকুরকে ধন্যি ধন্যি করল, ঘোড়াটাকে নিয়ে দুই মহাবীরের সঙ্গে রওনা দিল বাড়ির দিকে। যেতে, যেতে, যেতে ভারি তেষ্টা পেল তাদের — আর সত্যিই, রাস্তার ডান দিকে দেখে সায়র। দুই মহাবীর তার জল খেতে চাইছিল।

ইভান বললে, 'না, দাঁড়াও,' এই বলে আড়াআড়ি বাড়ি মারতেই রক্ত ছুটল, এখন, ওটা তো আর সায়র নয়, ওটা ছিল নাগের বোন। চলল এগিয়ে। ওদিকে ডুমুর গাছগুলোর তলে খাবারও নেই, বিছানাও নেই,

* ভারতীয় কংসের প্রতিরূপ। — সম্পাঃ

ছিল নাগের আরো দু'বোন। ইভান মারল তাদের। হঠাৎ দেখে কি — আকাশে মেঘ ঘনাচ্ছে। তবে সেটা তো মেঘ নয়, নাগের বুড়ি মা। একটা ঠোঁট তার আকাশে, আরেকটা মাটিতে।

চাষির-পো ইভান তখন বললে:

'এই ভায়ারা, এসো তিনজনে মিলে লড়ি, তোমাদের ছাড়া একা ওকে কাবু করা যাবে না।'

কিন্তু ওরা গেল ভয় পেয়ে — চম্পট দিল। ইভান ভাবে, 'একলা আমি গেছি।' হঠাৎ তার মনে পড়ল কাছেই আছে এক বিরাট কামারশালা। ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে প্রাণপণে সে ছুটে গেল সেখানে, দুই মহাবীরও তার পেছু পেছু: যাবার তো আর জায়গা নেই তাদের।

এল কামারশালায়:

'খোলো দরজা!'

কামাররা তাদের খুলে দিল বারোটা লোহার দরজা, ভেতরে ঢুকে গেল তারা, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নাগিনী ওদিকে কামারশালার কাছে এসে আগুনে জিব দিয়ে চাটতে লাগল দরজা। চাষির-পো ইভান দেখে ব্যাপার সুবিধের নয়, কামারদের বললে:

'তাড়াতাড়ি এই কামারশালার মতো বড়ো একটা হাল বানিয়ে দাও আমায় আর ওইরকমেরই একটা সাঁড়াশি।'

চটপট কাজে লেগে গেল কামাররা। নাগিনী ওদিকে তার আগুনে জিব দিয়ে নয়টা দরজা ভেদ করে এসে গেছে, ঠিক তখুনি হাল আর সাঁড়াশি বানিয়ে ফেলল কামাররা।

শেষ দরজাটায় নাগিনী যেই-না মাথা ঢুকিয়েছে, অমনি ইভান সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরল তার ঠোঁট, তারপর তাকে হালে জুতে চলে গেল মাঠে, চষো জমি। চাঙড় উলটে পড়তে লাগল এক একটা বাড়ির সমান।

চষতে চষতে চষতে শেষ পর্যন্ত ফুটিফাটা হয়ে গেল নাগিনী।

তখন সে নাগিনীকে ফেলে দিল সাগরে, নিজের ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিল মাঠে আর মহাবীরদের খেদিয়ে দিলে দু'চক্ষুর বাইরে।

'ভাগো তোমরা, কাপুরুষ যতসব, তোমাদের নিয়ে আমার ঝামেলার অন্ত নেই। আবার বলে কিনা বনেদি রক্ত...'

আর নাগের কাছ থেকে যে ঘোড়াটা নিয়েছিল, নিজে চলল তাতে চেপে। যায়, যায়, সামনে পড়ল বুড়ো কে একজন। কুশল না জানিয়ে চলে গেল পাশ কাটিয়ে, কিন্তু পরে ভাবল, 'সেকি, আমি অল্পবয়সী, আর দাদুকে কুশল জানালাম না। ফেরা দরকার...'

ফিরে এসে বললে:

'কুশল হোক, দাদু, মাপ করবেন আমায়, এই বেয়াড়াটাকে...'

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ, বুড়ো লোকদের সর্বদাই মান্য করতে হয়... এবার তাহলে শোনো, তুমি যাবে, তোমার দিকে লাফিয়ে আসবে কেঠো-পা এক বুড়ো, বলবে, "তা ছোকরা, ঘোড়া তোমার আছে, কিন্তু আমার সঙ্গে দৌড়ে পারবে না!" ওকে দৌড়ে হারাবার কথাও ভেবো না কিন্তু। আর পথে কারো দেখা পেলে সঙ্গে নিও। আপত্তি করো না...'

চলল ইভান। দেখে, কাঠের পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তার দিকে আসছে বুড়ো একটা লোক।

বললে, 'তা ছোকরা, ঘোড়া দেখছি তোর আছে, তবে আমি দুবলা হলেও আমার সঙ্গে দৌড়ে তুই পারবি না।'

'ও নিয়ে আমি তর্কেও যেতে চাই না; দৌড়ব না যখন বলছি, দৌড়বই না...'

চাষির-পো ইভান এই কথা বলতে না বলতেই বুড়ো কী একটা

ধারালো তীরের খোঁচায় তাকে জিন থেকে ফেলে দিয়ে নিজেই লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়, বাস উধাও। এখন, এ লোকটা তো আর কেউ নয়, খোদ ইরদ মহারাজ, নাগ আর তার বোনদের বাবা।

চাষির-পো ইভান ক্ষেপে উঠল:

বলে, 'এটা তোকে আমি ক্ষমা করব না, হতচ্ছাড়া ইরদ, পায়ে হেঁটেই আমি ধরব তোকে!

চলতে লাগল মুগুর নিয়ে... এদিকে তীরের খোঁচাটা ব্যথা করছে, যেন আগুনে ছ্যাঁকা দেওয়া, এমনকি নেতিয়েই পড়তে লাগল সে।

চাষির-পো ইভান ভাবলে, এটা সত্যিই বিপদের কথা, ইরদ রাজার তীর নিশ্চয় সাধারণ নয়, বিষমাখানো...

আরো কিছুদূর গিয়ে সে একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়ল। 'হ্যাঁ এখন আর ইরদ রাজাকে আমি মারব না, আমাকেই সে এক আঙুলেই টিপে মারবে...'

চলছে চাষির-পো ইভান, ভয়ানক মন খারাপ, সামনে পড়ল এক বুড়ো, মাটি পর্যন্ত দাড়ি। কুশল জানানো হল, জিজ্ঞাসাবাদ করা হল কে কোথায় যাচ্ছে। বুড়ো তখন বললে:

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'কিন্তু কে আপনি?'

'আমি কুকুর তাড়াই।'

অবাক লাগল চাষির-পো ইভানের, কিন্তু আগের বুড়োর উপদেশটা মনে পড়ায় চুপ করে রইল।

চলল আরো এগিয়ে, দেখা হল আরেকজন বুড়োর সঙ্গে, সেও জুটতে চাইল। বললে:

'আমি হিমদাদু।'

ফের চলতে লাগল, দেখা হল তৃতীয় বুড়োর সঙ্গে... জিজ্ঞাসাবাদ করা হল কে কোথায় যাচ্ছে। বুড়ো বললে:

'আমি সমুদ্রের ঘেসুড়ে, সমুদ্র কেটে আঁটি বানাই।'

'তা বেশ, চলো আমাদের সঙ্গে।'

পথে পড়ল আরো অনেক: 'খেয়েও খাঁই মেটে না','ঢকঢকিয়েও তেষ্টা ঘোচে না', 'দৌড়িয়েও দৌড় থামে না', 'চাবুক চালাই বিশ যোজন', 'নজর চলে বিশ যোজন'।

রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে চলছে তারা ইরদ রাজার কাছে, তারই রাজত্বে। দেখেশুনে ইরদ রাজার চক্ষু চড়ক, আগে কেউ কখনো তার রাজ্যের সীমানাতেও ঘেঁষে নি, হঠাৎ এরা ঢুকে পড়ল তার জমির মধ্যে... হুকুম দিলে ওদের দিকে সাত হাজার হিংস্র হায়েনা কুকুর লেলিয়ে দিতে, তাদের প্রত্যেকের দুটো করে মাথা।

ছুটে আসছে কুকুরগুলো, তা দেখে চাষির-পো ইভান বললে:

'এই তো ভাইসব, কুকুরেরা আমাদের কুটিকুটি করবে। আমার আর শক্তি নেই, কোনোরকমে পা টেনে টেনে চলছি, ওদের ঠেকাব, কোথায় সে সাধ্য!'

'আর আমি যে কুকুর তাড়াই,' বললে প্রথম বুড়ো।

এই বলে সে কী যে ঝাঁপিয়ে পড়ল... সবগুলোকে কচুকাটা করে গাদি দিলে। ইরদ রাজা দেখে কুকুরে কাজ হল না। দল বেঁধে ওরা হাঁটছে তার রাজ্যে। তার বাড়িতে হামলা করে ঢুকল আঙিনায়, লোহার বড়ো ফটকের মধ্যে দিয়ে, অমনি ঝপ! বন্ধ হয়ে গেল ফটকগুলো, ঠিক যেন এক মস্তো লোহার ঘরের মধ্যে আটকা পড়ল তারা। ইরদ রাজা চাকরবাকরদের হুকুম দিল দেয়াল ঘিরে অগ্নিকুন্ড জ্বালাতে, লোকগুলো যেন পুড়ে মরে। ডাঁই করা হল কাঠ, তার গোণাগুনতি নেই, লাগাও আগুন! তখন কাজে

নামল হিমদাদু — লোহার দেয়ালে হিমই জমে উঠল। সব কাঠ পোড়াল ইরদ রাজার চাকরেরা — ইরদ হুকুম দিল:

'দরজা খুলে আমার শত্রু চাষির-পো ইভানের ছাইগুলো জড়ো করো।'

খোলা হল দরজা, সবাই জীবন্ত। ইভান তখন বললে:

'কী তুমি রাজা, এমন নিষ্ঠুর: আমাদের এমন ঘরে রেখেছ যে ঠান্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছিলাম...'

ইরদ বললে, 'যাক গে, গর্দান তোর এখুনি নিতে পারি, তোকে যে বিষ দেওয়া হয়েছে, লড়তে পারবি না আমার সঙ্গে।' তবে নিজে মনে মনে ভাবে, 'মারা, সে একসময় মারলেই হল,' তাই বললে:

'শোনো, তোমাদের একটা কাজ দিচ্ছি: এক রাতের মধ্যে সমুদ্রকে ঘাস-কাটা করে আঁটি বাঁধবে। তা করতে পারলে ছেড়ে দেব, নইলে গর্দান যাবে।'

ঘুমতে গেল ইরদ, আর যে বুড়ো সমুদ্রকে ঘাস-কাটা করে, সে তাকে কেটেকুটে আঁটি বেঁধে ফেলল। সকালে ঘুম ভাঙল ইরদের, দেখে একবিন্দু জলও কোথাও নেই। আরে, এ কী তাজ্জব কান্ড! অন্য একটা কাজ চাপাল:

'আমার যত গরুমোষ আছে তা দিয়ে মাংস রাঁধা হবে। যদি সবটা খেতে পারো, বেঁচে থাকবে। না পারলে গর্দান যাবে।'

চাষির-পো ইভান ভাবে, 'তাড়াতাড়ি ঘা'টা শুকলে হয়, তাহলে দেখাতাম ওকে আমাদের জ্বালাতন করার মজাটা কী।' এখন ইরদের ছিল এক বন্দিনী কুমারী, পরমাসুন্দরী, ইভানকে সারিয়ে তোলার ভার নিল সে, নানারকমের শেকড়বাকড় লতাপাতা সে জানত। ওদিকে ইরদ রাজা এত খাবার বানাল যে রাজপুরীর সমস্ত হান্ডাতেও আর আঁটে না, ভোদকা তৈরি হল কয়েক হাজার পিপে। খেতে বসল তারা, খাওয়া হল কেবল একটা বলদ। চাষির-পো ইভান মুষড়ে পড়ল: তিন বছরেও আমরা সব খেয়ে উঠতে পারব না!'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে তাদের সঙ্গে আছে দুই বুড়ো: 'খেয়েও খাঁই মেটে না' আর 'ঢকঢকিয়েও তেষ্টা ঘোচে না'। সে দু'জন যেই গিলতে শুরু করল, খাবারদাবারে আর কুলোয় না...

ইরদ রাজা দেখে কিছুতেই পারা যাচ্ছে না, ভেবেছিল মেরেই ফেলবে, তবে শেষকালে ঠিক করলে আরো একটু জ্বালানো যাক।

'আমার মেয়ে ধোঁ-ছুটকি কিংবা তোমরা, কাল সকালে সাগর থেকে কে জল নিয়ে আসতে পারবে আগে? যদি তোমরা পারো, বেঁচে থাকবে, না পারলে...'

ইভান ওদিকে কেবলি ভাবে, 'ঘা'টা তাড়াতাড়ি শুকলে বাঁচি...'

বন্দিনী কন্যে কিন্তু বলে:

'দুঃখু ক'রো না, আর বেশি দেরি নেই।'

রাত কাটল। ধোঁ-ছুটকি পরল তার রণ-পা জুতো, মায়া টুপি যাতে অদৃশ্য হওয়া যায়, বালতি নিয়ে ছুটল সাগরে। ওরা ওদিকে বসে বসে ভাবে কী করা যায়। তখন মনে পড়ল আছে তাদের এক বুড়ো — 'দৌড়েও দৌড় থামে না'। ছুটল সে, জল নিল সে ইরদের মেয়ে ধোঁ-ছুটকির আগেই। মেয়েটা তা দেখতে পেয়ে তার পায়ে ছুঁড়ে মারল ঘুম-নামানো গুঁড়ো, বুড়োও অমনি ঘুমিয়ে পড়ল।

ইরদের মেয়ে ততক্ষণে বাড়ি ফিরছে, অথচ তাদের 'দৌড়েও দৌড় থামে না'-র টিকিও দেখা যাচ্ছে না। আর বিশ যোজন যার নজর, সে দেখতে পেল 'দৌড়েও দৌড় থামে না' ঘুমচ্ছে। তখন যার চাবুক চলে বিশ যোজন, সপাং করে সে চাবুক হাঁকাল ঘুমন্ত বুড়োর ওপর। ছুটল বুড়ো বালতি নিয়ে, জল নিয়ে এল ধোঁ-ছুটকির আগে।

ইরদ দেখল ওরা সবই পারে, তাই তরোয়াল নিয়ে হুকুম দিলে ইভান আর তার সঙ্গীদের লোহার মাড়াইতলায় টেনে নিয়ে যেতে।

চলল ইভান, বন্দিনী কন্যা কিন্তু বলে দিলে:

'ঘা তোমার সেরে গেছে।'

নিয়ে আসা হল ইভানকে, আর ইরদ রাজা যেই তার তরোয়াল তুলতে যাবে ইভান তাকে খপ করে ধরে ছুড়ে দিলে কেল্লার চুড়োয়! ইরদ রাজার প্রাণ গেল। যে ঘোড়াটা ইরদ রাজা তার কাছ থেকে বেহাত করে নিয়েছিল, সেটা নিল ইভান। বন্দিনী কন্যেও তার সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি হল: বুড়োরা কিন্তু বললে:

'তা চাষির-পো ইভান, তোমার কাজ যা করবার তা তো করে দিলাম, এবার চলি নিজেদের পথ ধরে, অন্য সব ভালো লোকের জন্যেও তো খাটতে হবে।'

ইভানকে চুমু খেয়ে চলে গেল তারা।

চাষির-পো ইভান এল নিজেদের রাজ্যে, যে ঘোড়া আগুন খায়, শিখায় চুমুক দেয়, ছুটলে বিশ যোজন ধরে মাটি কাঁপে, ওকগাছের পাতা ঝরে পড়ে, সেটা দিয়ে দিল রাজাকে। আর বনেদি রক্তের যে মহাবীরদের রাজা পাঠিয়েছিল ইভানের সঙ্গে, তারা ইরদের বন্দিনী মেয়েটিকে দেখেই রাজার কান ভাঙাতে লাগল:

'হেন তেন, দেখুন না, সাধারণ এক চাষার ছেলে, অমন সুন্দরীর যুগ্যি নয় সে, ও মেয়ে হতে পারে কেবল বনেদি রক্তের মহাবীরের বৌ।'

রাগে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল চাষির-পো ইভান:

'আমি ওকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছি, আমায় সে ভালোবাসে, আমিও ওকে ভালোবাসি। ওকে আমি কাউকে দেব না।'

রাজা বলে, 'উঁহু, দিতে হবে।'

ইভান তখন খেপে উঠে রাজাকে বললে:

'তুমি কথা দিয়েছিলে আমায় পুরস্কার দেবে, কখনো আমার মনে

দুঃখু দেবে না। তিনটে নাগ-দানব আমি মেরেছি, বুড়ি নাগিনীকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, ইরদ রাজাকে পাঠিয়েছি পরপারে, আর তুমি যদি এমনি করে তার প্রতিদান দিতে চাও, এমনি করে কথা রাখো, তাহলে এক ঘায়ে সবংশে নির্বংশ করব তোমায়!

তারপর এমন করে তার মুগুর হাঁকাল যে সঙ্গে সঙ্গে নুয়ে পড়ল সমস্ত গাছ, টলে উঠল রাজার পুরী।

তখন ভয় পেয়ে রাজা আর টুঁ শব্দটিও করল না। চাষির-পো ইভান পরমাসুন্দরী কন্যেকে বিয়ে করে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল, তবে রাজা আর বনেদিদের কোনো কথাই আর বিশ্বাস করত না সে।



লাইম গাছটি আর অতিলোভী বুড়ির কাহিনী

এক-যে ছিল বুড়ো আর বুড়ি। বড়ো গরিব তারা। বুড়ি একদিন বললে:

'তুমি বুড়ো বনে গিয়ে কিছু লাইম কাঠ কেটে আনলেও তো পার। আঁচ দেবার মতো তো কিছু থাকবে।'

বুড়ো বললে, 'বেশ।' কুড়ুল নিয়ে চলে গেল বনে।

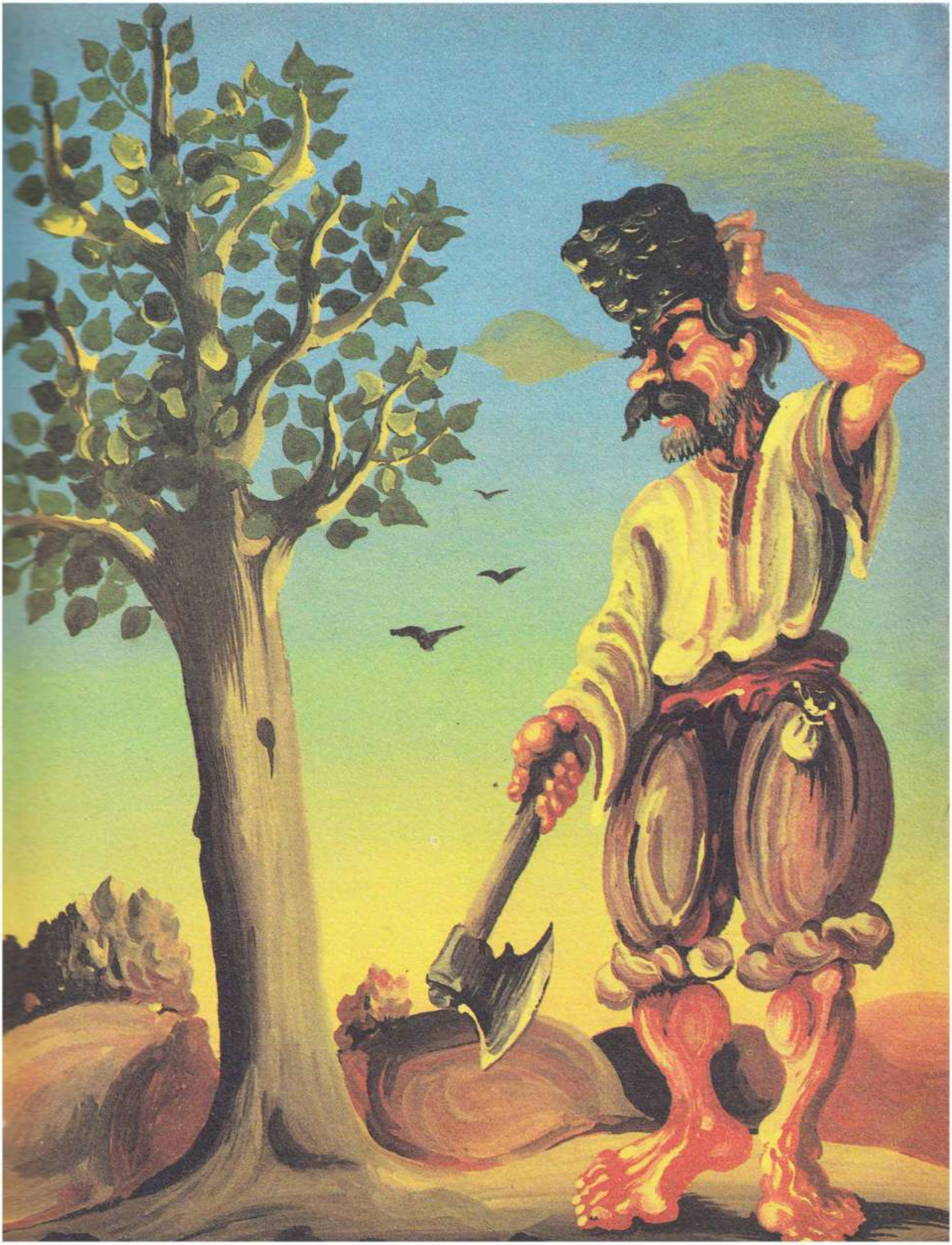
বুড়ো তো এল বনে। একটা লাইম গাছ বেছে নিয়ে কাটবার জন্যে যেই কুড়ুল হাঁকিয়েছে, হঠাৎ শোনে মানুষের ভাষায় লাইম বলছে:

'হেই গো, ভালো মানুষ, কেটো না আমায়, তোমার বিপদে কাজে লাগব।'

ভয়ে বুড়োর হাত থেকে কুড়ুল খসে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে গেল বাড়ি।

বাড়ি এসে বললে কী ঘটেছিল। বুড়ি কিন্তু বলে:

'আহ্ কী বোকা তুমি? এক্ষুনি লাইম গাছের কাছে গিয়ে বলো একটা ঘোড়া আর তার সঙ্গে গাড়ি দিতে। তোমার আমার পায়ে হেঁটে আসা যাওয়া অনেক হল বাপু।'



'তা বলছ যখন, বেশ,' এই বলে বুড়ো টুপিটি মাথায় দিয়ে চলে গেল।

লাইম গাছের কাছে এসে বললে:

'লাইম, ও লাইম, বুড়ি হুকুম করেছে তুমি যেন আমাদের একটা ঘোড়া আর সেইসঙ্গে গাড়ি দাও।'

লাইম গাছটি বললে, 'ঠিক আছে, বাড়ি যাও।'

বাড়ি ফিরল বুড়ো, কুঁড়ের কাছে গাড়ি দাঁড়িয়ে, তাতে জোতা ঘোড়া।

বুড়ি বললে, 'দেখছ তো বুড়ো, এখন আমাদের মনিষ্যি বলা চলে। শুধু আমাদের কুঁড়েটা ভেঙে পড়ো-পড়ো। যাও বুড়ো, একটা বাড়িও চেয়ে নাও ওর কাছে। হয়ত দেবে।'

লাইম গাছের কাছে গেল বুড়ো, চাইল একটা বাড়ি।

লাইম গাছটি বললে, 'ঠিক আছে, বাড়ি যাও।'

বাড়ি এল বুড়ো, চিনতে আর পারে না। পুরনো কুঁড়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নতুন, দেখনসই এক কোঠাবাড়ি। ছেলেমানুষের মতো আনন্দ তাদের।

'তা বুড়ো, আরো কিছু গরুবাছুর হাঁসমুরগি চাইলে পার, তাহলে আর কিছু আমাদের লাগবে না।'

লাইম গাছটির কাছে গিয়ে বুড়ো গরুবাছুরও চাইল।

'ঠিক আছে,' লাইম গাছটি বললে। 'বাড়ি যাও।'

বাড়ি এল বুড়ো, আনন্দ আর ধরে না, গরুবাছুর, হাঁসমুরগিতে আঙিনা ভরা।

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ, এবার আর আমাদের আর কিছুর দরকার নেই।'

'না বুড়ো, যাও গো, গিয়ে টাকাও চেয়ে নাও।'

লাইম গাছটির কাছে গিয়ে বুড়ো টাকাও চাইল।

'ঠিক আছে,' লাইম গাছটি বললে, 'বাড়ি যাও।'

বাড়ি এল বুড়ো, বুড়ি ওদিকে টেবিলের সামনে বসে মোহর গাদি করছে।

বুড়ি বললে, 'হ্যাঁ, এই তো বুড়ো, এখন আমরা বেশ বড়োলোক! তবে এতেও হয় না, লোকে আমাদের যাতে ভয় পায়, সেটাও দরকার, আমরা তো এখন ধনী! লাইম গাছের কাছে যাও বুড়ো, বলো গে, এমন যেন করে দেয় লোকে যাতে ভয় পায় আমাদের।'

লাইম গাছটির কাছে গেল বুড়ো, চাইলে যেন ওইরকমটাই হয়।

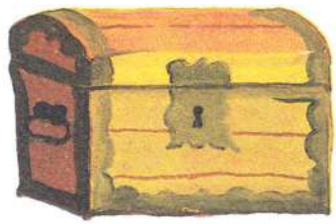
'ঠিক আছে,' বললে লাইম গাছটি। 'বাড়ি যাও।'

বাড়ি এল বুড়ো, সেপাই লশকর গিজগিজ করছে সেখানে, পাহারা দিচ্ছে তাদের। কিন্তু এতেও বুড়ির মন ওঠে না।

বললে, 'তা বুড়ো, এবার দরকার গাঁয়ের সব লোক যেন আমাদের ক্ষেতমজুর হয়, আর কিছু আমাদের তো এখন চাইবার নেই, সবই আছে আমাদের।'

গেল বুড়ো লাইম গাছটির কাছে, চাইল যেন ওইরকমটাই সে করে দেয়। অনেকখন চুপ করে রইল লাইম গাছটি। শেষে বললে, 'বাড়ি যাও, তোমাদের শেষ ইচ্ছেও পূরণ করব।'

বাড়ি এল বুড়ো, দেখে কিছুই নেই, দাঁড়িয়ে আছে সেই পুরনো কুঁড়েটা, তার কাছে বুড়ি। অতিলোভী বুড়ির ইচ্ছে হয়েছিল সব লোককে ক্ষেতমজুর করবে, এই তার শাস্তি।



বুড়োর মেয়ে আর বুড়ির মেয়ে

এক-যে ছিল বুড়ো আর বুড়ি, একটি মেয়ে ছিল তাদের। ধরাধামে বুড়ির কতদিন কাটল কে জানে, মরণ ঘনাল। আর মরণের সময় বুড়োকে বললে:

'শোনো বুড়ো, যদি বিয়ে করার সাধ হয়, দেখো, পড়শি যে বিধবাটি মেয়ে নিয়ে থাকে, তাকে ঘরে তুলো না। সে তোমার বৌ হবে, কিন্তু আমাদের মেয়ের মা হবে না!'

বুড়ো বললে, 'বেশ, কাউকেই বিয়ে করব না!'

বুড়িকে কবর দিল বুড়ো, যেমন উচিত, শেষকৃত্য করল, থাকতে লাগল একা-একা।

কিছু কাল বাদে সে একবার গাঁয়ে বেড়াতে বেড়াতে গেল সেই বিধবার বাড়িতে, বুড়ি যার কথা বলেছিল। বুড়িকে যে কথা দিয়েছিল কাউকে সে



বিয়ে করবে না, সেটা সে ভুলে গেল। বসে রইল বিধবার কাছে, একথা সেকথা হল, শেষে পাড়ল বিয়ের কথা। বিধবা তো আনন্দে আর বাঁচে না।

বলে, 'এতদিন আমি এরই পথ চেয়ে ছিলাম।'

নিজের সমস্ত জিনিসপত্র গুটিয়ে বাটিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে উঠে গেল বুড়োর সঙ্গে থাকতে।

বুড়োর মেয়ে আর বুড়ির মেয়েও থাকে একসঙ্গে।

এখন, বজ্জাত মাগিটা দেখতে পারে না বুড়োর মেয়েকে: বেচারি মেয়েটিকে খাটিয়ে মারে।

দুই মেয়েরও প্রায়ই ঝগড়া হয় নিজেদের মধ্যে।

গেল হয়ত সাঁঝের আসরে।

বুড়োর মেয়ে সুতো কাটে, আর বুড়ির মেয়ে ফুর্তি করে কাটায় সারা রাত। নিজের সমস্ত সুতোয় জট পাকিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে ধিঙ্গি মেয়েটা।

বাড়ি ফেরে ভোর-ভোর। বেড়ার কাছে এসে বুড়ির মেয়ে বলে:

'তোর নাটাই দে বোন, আমি ধরে রাখছি, তুই বেড়া ডিঙো।'

সে মেয়ে বলে, 'তা নে, ধর বোন।'

বুড়োর মেয়ে যখন বেড়া ডিঙোয়, বুড়ির মেয়ে ততক্ষণে নাটাই নিয়ে ছুটে যায় মায়ের কাছে, সাত-সতের লাগায়, সৎবোন যেন ফুর্তি করেছে সারা রাত, সুতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে জট পাকিয়েছে।

'আমি কিন্তু সুতো কেটে বাড়িও নিয়ে এলাম। দেখেছ কেমন সে আলসে, বেআক্কেলে।'

বাড়ি আসে বুড়োর মেয়ে, সৎমা তাকে চড়চাপড় মারে, নালিশ করে বুড়োর কাছে:

'মেয়ে তোমার অকম্মার ঢেঁকি, খাটতে চায় না। তুমিও কিছু বলো না ওকে।'

সৎমা যতই রাগারাগি করুক, সৎমেয়েকে যতই গঞ্জনা দিক, বুড়োর কাছে যতই-না তার নামে লাগাক, মেয়েটি সবই সয়ে যায়: চুপচাপ কাজ করে যায় নিজের মনে। তা দেখে পিত্তি জ্বলে যায় মাগির, বুড়ো ওকে মায়া করে বলে ক্ষেপে ওঠে।

মা-মেয়ে পরামর্শ করতে লাগল কী করে সৎমেয়েকে সরিয়ে দেওয়া যায় ধরাধাম থেকে। বুড়োকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল বুড়ি:

'মেয়ে তোমার আলসে, কোনো কাজ করতে চায় না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় আর ঘুমোয়। আর তোমার যত মায়া ওর জন্যে! কারো ঘরে ওকে ঝিগিরিতে লাগালেও তো পারো!'

বুড়ো শুধোয়, 'কিন্তু এখানে দেব কার ঘরে?'

'এখানে কোনো জায়গা না থাকলে নিয়ে যাও যেখানে খুশি। ওর ছায়াও যেন আর না দেখি।'

হতচ্ছাড়ি মাগি এমন তার পেছনে লাগল, দিনের পর দিন এমন তাকে জ্বালাতে শুরু করল যে বুড়ো অন্ধকার দেখল চোখে। মেয়েটার জন্যে কষ্ট হয়, কিন্তু করার কিছু নেই।

তাই একদিন রওনা দিল দু'জনে। গেল তারা ঘুরঘুটি বনের মধ্যে। মেয়েটি তখন বললে:

'বাবা তুমি বাড়ি যাও, বাকিটা আমি যাব একাই। কাজ একটা জুটিয়ে নেব।'

বুড়ো বললে, 'বেশ।'

বিদায় নিয়ে বুড়ো গেল একদিকে, মেয়েটি অন্যদিকে।

চলেছে মেয়েটি, চলেছে সেই ঘুরঘুটি বন দিয়ে; দেখে এক

আপেল গাছ, এমন নেতিয়ে পড়া, আগাছায় ঢাকা যে চোখেই পড়ে না।

আপেল গাছ তাকে বললে:

'ও ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় সাফসুফ করে একটু নিড়িয়ে দাও, আমি তোমার খুবই কাজে লাগব।'

তা বুড়োর মেয়ে আস্তিন গুটিয়ে আপেল গাছ পরিষ্কার করে নিড়িয়ে বালি ছিটিয়ে দিল চারিপাশে। আপেল গাছ তাকে ধন্যি ধন্যি করলে, মেয়েটিও চলল এগিয়ে।

চলেছে মেয়েটি, চলেছে, তেষ্টা পেল তার। ঝর্ণার কাছে গেল সে, ঝর্ণা বললে:

'ওগে ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় পরিষ্কার করে সাজিয়ে দাও, আমি তোমার কাজে লাগব!'

মেয়েটিও ঝর্ণাকে পরিষ্কার করে চারিপাশে বালি ছিটিয়ে দিল। ঝর্ণা তাকে ধন্যি ধন্যি করলে, মেয়েটিও চলল এগিয়ে।

ছুটে এল এক কুকুর, এমন ঘেয়ো যে চোখে দেখা যায় না। বললে:

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমার পরিষ্কার করে দাও, আঁচড়ে দাও লোম, আমি তোমার খুবই কাজে লাগব।'

মেয়েটি তাকে পরিষ্কার করে লেজ থেকে চোরকাঁটা তুলে দিল।

'ধন্যি গো তোমায়!' কুকুর বললে।

'ধন্যি বলার কী আছে,' এই বলে মেয়েটি চলল এগিয়ে।

দেখে একটা চুল্লি, চটা-ওঠা, কালো, পাশে কাদা। চুল্লি বলে:

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় একটু নিকিয়ে মাখিয়ে ফিটফাট করে দাও, আমি তোমার খুবই কাজে লাগব।'

মেয়েটিও তাই কাদা ছেনে, যেমন উচিত তা লেপে, তার গায়ে ফুল-পাতা এ'কে দিল। চুল্লি তাকে ধন্যি ধন্যি করল, মেয়েটিও চলল এগিয়ে।

যায়, যায়, সামনে পড়ল একজন মেয়েমানুষ। বলে:

'কুশল হোক গো মেয়ে!'

'কুশল হোক।'

'চলেছ কোথায়?'

'যাচ্ছি, যদি কেউ চাকরানির কাজে নেয়।'

'চলো আমার কাছে!'

'বেশ,' মেয়েটি বললে, 'তাই যাব।'

মেয়েমানুষটি বললে: 'আমার বাড়িতে কাজ তেমন কঠিন নয়, কেবল আমি যা দেখিয়ে দেব সেইভাবে করবে। পারবে তো?'

'না পারবার কী আছে? একবার দেখিয়ে দেবেন, তারপর আমিই করে যাব।'

বাড়ি এল তারা; মেয়েমানুষটি বললে:

'তাহলে মেয়ে, ঐ দেখো হাঁড়ি-কলসী। সকাল সন্ধেয় ঐ হাঁড়ি-কলসীতে জল ফোটাবে, সে জল ঢালবে গামলায়, তাতে ময়দা দিয়ে ফে'টাবে, তবে দেখো যেন গরম না থাকে! তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শিস দেবে তিনবার। নানা জন্তুজানোয়ার আসবে তোমার কাছে — ভালো করে খাওয়াবে তাদের। ভয় পেও না, কোনো ক্ষতি করবে না তোমার।'

মেয়েটি বললে:

'ঠিক আছে, যা বললেন, সব তাই করব।'

রাতের খাওয়া সারল তারা। চুল্লি ধরাল মেয়েটি, জল গরম করলে, গামলায় তা ঢেলে ময়দা দিয়ে ফে'টাল।

তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার শিস দিল জোরে জোরে। অমনি গামলার কাছে ছুটে এল যত রাজ্যের জন্তুজানোয়ার। খেয়ে দেয়ে সবাই চলে গেল যার যেখানে দরকার।

এইভাবেই গোটা বছর বুড়োর মেয়ে খেটে গেল, কর্ত্রীঠাকরুন যা বলত সবই করত।

তারপরে তো বছর শেষ হল, বুড়োর মেয়েকে কর্ত্রীঠাকরুন তখন বললে:

শোনো মেয়ে, আমার বাড়িতে রইলে তুমি ঠিক এক বছর। যদি চাও, আরো থাকতে পারো। যদি না চাও, সে তোমার ইচ্ছে। আমার এখানে ভালো কাজ করেছ তুমি, ধন্যি তোমায়।'

রুটি আর নুন আর সবকিছুর জন্যে কর্ত্রীকে ধন্যি জানিয়ে মেয়েটি বললে:

'বাড়ি যেতে চাই। ধন্যি আপনাকে মাঠাকরুন!'

কর্ত্রী তখন তাকে বললে:

'যাও, যেমন পছন্দ ঘোড়া আর গাড়ি নাও গে।'

আর নিজে তার জন্যে নানারকম ভালোমন্দ জিনিসের পোঁটলা বেঁধে পেঁাছে দিলে বনের কিনারা পর্যন্ত। সেখানেই বিদায় নেওয়া হল।

কর্ত্রী বাড়ি ফিরে গেল আর বুড়োর মেয়ে রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে, ভারি তার আনন্দ যে সব ভালোয় ভালোয় কাটল।

যাচ্ছে সেই চুল্লিটার কাছ দিয়ে, যেটা সে একসময় নিকিয়ে দিয়েছিল, দেখে — চুল্লি ভর্তি মিঠে রুটি। চুল্লি বললে:

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, তুমি যে আমায় গুছিয়ে গাছিয়ে ফিটফাট করে দিয়েছিলে, এ রুটিগুলো তাই তোমার জন্যে।'

মেয়েটি তাকে ধন্যি দিয়ে চুল্লির কাছে যেই যেতে গেল, রুটিগুলোও

অমনি তিড়িক তিড়িক — নিজেরাই লাফিয়ে উঠল গাড়িতে। চুল্লির মুখ বন্ধ হয়ে গেল, মেয়েটিও চলল এগিয়ে।

যায়, যায়, দেখে সুন্দর ঝকঝকে লম্বা একটা মালা নিয়ে ছুটে আসছে সেই কুকুরটা। গাড়ির কাছে ছুটে এসে কুকুর বলে:

'এই নাও ঝিয়ারি-সুন্দরী, তুমি যে আমার লোম আঁচড়ে দিয়েছিলে, লেজ থেকে চোরকাঁটা তুলে ফেলেছিলে তার জন্যে!'

সেটি নিয়ে ধন্যি জানিয়ে আনন্দ করে এগিয়ে চলল মেয়েটি।

চলেছে মেয়েটি, ভারি তেষ্টা পেল, সইতে আর পারে না! ভাবল, 'যেটা পরিষ্কার করেছিলাম, সেই ঝর্ণাটার কাছে গিয়ে জল খাওয়া যাবে।'

এল সেখানে, দেখে ঝর্ণা একেবারে জলে টলমল, উপচে পড়ছে। আর তীরে সোনার জালা আর হাতা।

ঝর্ণা বললে:

'জল খাও, জালাটা ভরে নাও, হাতাটাও ভুলো না।'

জল খেতে লাগল মেয়েটি, আর সে তো জল নয়, অমৃত। এত সুস্বাদু যে কখনো তা খায় নি।

পুরো জালা ভরে অমৃত নিলে, হাতাটাও ভুলল না। তারপর তো চলল আরো এগিয়ে।

দেখে — আপেল গাছটা। এমন ঝাঁকড়া যে চোখ আর সরে না। সোনা রুপোর আপেল তাতে অঢেল! আপেল গাছ বললে:

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, তুমি যে আমায় সাফসুফ করে সাজিয়েছিলে, তাই এই আপেলগুলো তোমার জন্যে।'

মেয়েটি বললে:

'ধন্যি তোমায়।'

যেতে গেল আপেল গাছের কাছে, আপেলগুলো অমনি ঝুপঝাপ — নিজেরাই ঝরে পড়ল গাড়িতে।

বুড়োর মেয়ে তো বাড়ি এল, ডাকতে লাগল:

'এসো বাবা, জিনিসপত্র ঘরে তোলো!'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ো দেখে, মেয়ে ফিরেছে; ভারি আনন্দ হল তার। মেয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বলে:

'কোথায় ছিলি রে বাছা?'

মেয়ে বললে, 'খাটছিলাম বাবা। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে চলো।'

আর জিনিস তো ওদিকে গাড়ি ভর্তি, তার ওপর দামি একটা হার!

ঘরে তুলতে লাগল জিনিসপত্র — একটা যদি-বা ভালো, আরেকটা আরো ভালো। এখন, মাগি দেখে যে বুড়োর মেয়ে কত কিছু এনেছে, সেও অমনি তার নিজেরটা নিয়ে পড়ল:

'নিয়ে যাও বাপু, নিয়ে যাও আমার মেয়েকে, যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে নিজের মেয়েকে!'

এমন ক'রে তার পেছনে লাগল যে বুড়ো শেষ পর্যন্ত বললে:

'বেশ, তোড়জোড় করুক, নিয়ে যাব।'

তারপরে তো বিদায়-টিদায় নিয়ে বুড়ির মেয়েকে সঙ্গে করে রওনা দিলে বুড়ো। গেল বনে, বুড়ো বললে:

'তা এবার যাও গো মেয়ে, আমি বাড়ি ফিরি।'

সে বললে, 'ঠিক আছে।'

ছাড়াছাড়ি হল: মেয়েটি গেল বনের মধ্যে, বুড়ো ঘরে ফিরল।

বুড়ির মেয়ে তো চলল ঘুরঘুটি বনের মধ্যে দিয়ে, দেখে — আপেল গাছ, ভারি নেতিয়ে পড়েছে, আগাছায় এমন ঢাকা, দেখাই যায় না।

আপেল গাছ বললে: 'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় সাফসুফ করে নিড়িয়ে দাও, আমি তোমার খুবই কাজে লাগব।'

আর মেয়েটি জবাব দেয়:

'বটে, আমি আমার হাত নোংরা করব! সময় নেই আমার!' চলে গেল এগিয়ে।

দেখে — ঝর্ণা বইছে, ভারি নোংরা, পানায় ঢাকা। ঝর্ণা বললে:

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় পরিষ্কার করে সাজিয়ে দাও, আমি তোমার কাজে লাগব!'

'কী যত কাজ চাপাচ্ছ আমার ঘাড়ে। সময় নেই আমার। তাড়াতাড়ি যেতে হবে!'

এই-না বলে বুড়ির মেয়ে চলল এগিয়ে।

গেল সেই চুল্লিটার কাছ দিয়ে। চুল্লি চললে:

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, নিকিয়ে দাও আমায়, পরিপাটী করে দাও, আমি তোমার খুব কাজে লাগব!'

'লোক পেলে যা-হোক, তোমার জন্যে নোংরা মাখব আমি!' এই বলে মুখ ঝামটা দিয়ে এগিয়ে চলল বুড়ির মেয়ে।

দেখে — কুকুর ছুটে আসছে, এমন ঘেয়ো যে চেয়ে দেখা যায় না।

'ওগো ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় সাফসুফ করে লোম আঁচড়ে দাও, আমি তোমার খুব কাজে লাগব।'

'কী আবদার! অমন একটা হেগো, ওকে দিয়ে ঝামেলা পোয়াব কিনা আমি! ওসব চলবে না!' চলল এগিয়ে।

এবার সামনে পড়ল সেই মেয়েমানুষটি, বুড়োর মেয়ে যার ঘরে কাজ করেছিল।

বললে, 'কুশল হোক গো মেয়ে।'

'কুশল হোক মাসি!'

'যাচ্ছ কোথায়?'

'এই মাসি কোথাও একটা কাজ খুঁজছি।'

'চলো আমার সঙ্গে।'

'বেশ। তা কিরকম কাজ আপনার?'

'তেমন কঠিন কিছু নয় বাছা। আমি যা বলব, তা করতে পারলেই হল।'

'পারব না কেন? একবার বলে দেবেন, পরের বার থেকে নিজেই করে যাব।'

মেয়েমানুষটি বললে, 'তা শোন মেয়ে। ওই যে দেখছ হাঁড়ি-কলসী? সকাল সন্ধেয় ওতে করে জল ফোটাবে; সে জল গামলায় ঢেলে ময়দা দিয়ে ফেঁটাবে। তবে দেখো, যেন গরম না থাকে! পরে দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শিস দেবে তিনবার। নানা জন্তুজানোয়ার আসবে তোমার কাছে; তুমি ওদের ভালো করে খাওয়াবে, ওরা তারপর নিজেরাই চলে যাবে যার যেখানে দরকার। ভয় পেও না ওদের, কোনো ক্ষতি করবে না তোমার। পারবে করতে?'

'পারব,' বললে বুড়ির মেয়ে।

এই তো কথা হল, তারপর সন্ধেয় চুল্লি ধরাল বুড়ির মেয়ে, জলভরা হাঁড়ি বসাল, জল ফুটে উঠতেই পুরো এক টুকরি ময়দা ঢালল তাতে, ফলে দাঁড়াল মাড় নয়, ঘ্যাঁট। সেই ঘ্যাঁট ঢালল গামলায়, নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে শিস দিল — এক, দুই, তিন বার... আসতে লাগল জন্তুজানোয়াররা। গামলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা, আর যেই জিনিসটা মুখে তোলে, অমনি চিৎ হয়ে পড়ে। ছ্যাঁকা খেয়ে আর দম আটকে মরল সবাই।

বুড়ির মেয়ে দেখে সবাই খেয়ে শুয়ে পড়ল, আর ওঠে না। কর্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে:

'কী অদ্ভুত ঠাকরুন আপনার এই জন্তুজানোয়াররা। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল, আর উঠছে না যে?'

'উঠছে না মানে?' চিৎকার করে কর্ত্রী ছুটে গেল গামলার কাছে।

দেখল কেউ বেঁচে নেই, মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠল:

'হায়রে বাছারা, হায়রে সোনারা! কী করলি তুই! সবাইকে যে মারলি!'

বকাবকি করল কর্ত্রী, কাঁদল, কিন্তু তাতে আর কী হবে। সব জন্তুগুলোকে গাদি করে তালাবন্ধ করে রাখল।

এক বছর কাটল বুড়ির মেয়ের, কর্ত্রী তাকে দিল ঘেয়ো একটা ঘোড়া, ভাঙাচোরা একটা গাড়ি, চাকায় তেল-টেল দেওয়া নেই, গাড়িতে জন্তুদের পচে ওঠা লাসগুলো গাদি করে চাপিয়ে তাকে পেঁাছে দিল বনে।

বুড়ির মেয়ে গেল সেই চুল্লিটা পর্যন্ত, ভারি তার ক্ষিদে পেয়েছিল। এদিকে চুল্লির কাছে মিঠে রুটি — সরেস, রাঙা-রাঙা। কিন্তু যেই একটার দিকে হাত বাড়াতে গেছে, অমনি তিড়িক, তিড়িক — সবকটা লাফ দিয়ে ঢুকল চুল্লির ভেতরে, বন্ধ হয়ে গেল তার মুখ। চুল্লি বললে:

'আরে মেয়ে, আমার গা লেপে দাও নি, পিঠেও তোমায় পেতে হবে না!'

কেঁদে কেটে মেয়ে চলল এগিয়ে।

পেঁাছল সেই ঝর্ণাটার কাছে। ভারি তেষ্টা পেয়েছিল তার। দেখে গলগলিয়ে জল বেরচ্ছে; মেয়েটিও ছুটল সেদিকে, ঝর্ণা ওদিকে হঠাৎ শুকিয়ে গেল, ফিসফিসিয়ে বললে:

'আরে মেয়ে, আমায় ঠিকঠাক করে দিতে চাও নি, এখন জলও তোমায় খেতে হবে না।'

কেঁদে কেটে মেয়ে চলল আরো এগিয়ে।

গেল সেই আপেল গাছটা অবধি। আর তাতে এত আপেল যে মুরগির পক্ষে ঠোকরাবারও জায়গা নেই, আর সবই ভারি সুন্দর — রুপোলি, সোনালি। ভাবলে:

'আপেলগুলো অন্তত ঝাঁকিয়ে ফেলি, মায়ের জন্যে নিয়ে যাব।'

কেবল গেছে, অমনি সব ডাল উঠে গেল ওপরে। গাছ বলল, 'আরে ঝিয়ারি-সুন্দরী, আমায় গোছগাছ করে দিতে চাও নি, আপেলও খেতে হবে না তোমায়!'

বুড়ির মেয়ে কেঁদে কেটে আরো এগিয়ে গেল।

দেখে ছুটে আসছে কুকুর, গলায় তার হার, ভারি সুন্দর, ঝকঝকে আর লম্বা। কুকুরের দিকে ছুটে গেল মেয়ে, হারটা নিতে চেয়েছিল, কিন্তু কুকুর বললে:

'আরে মেয়ে, আমায় আঁচড়ে ফিটফাট করে দিতে চাও নি, গয়না পরে বেড়াবে, সেটি হবে না!'

এই বলে ছুটে পালাল। বুড়ির মেয়ে কেঁদে কেটে আরো এগুতে থাকল।

শেষে এসে তো পেঁছিল বাড়িতে। বুড়োবুড়িকে ডাকল:

'এসো, জিনিসপত্র ঘরে তোলো।'

বুড়োবুড়ি ছুটে বেরল বাড়ি থেকে, দেখে — মেয়ে এসেছে। খুশি হয়ে উঠল তারা, মেয়েকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে, মোটঘাট নিয়ে এল। আর মোটঘাট খুলে দেখে কি — তাতে কোলাব্যাং, গিরগিটি, তক্ষক! মাগি চেঁচিয়ে উঠল:

'এসব কী রে মেয়ে?'

বুড়ির মেয়ে তখন বলতে লাগল কী ঘটেছিল। বললে সবই, বুড়ি তখন বললে:

'তুই বরং বাড়ি বসে থাক, কত জিনিসপত্র আনল ও মেয়ে, আর তুই আনলি যত মরা সাপ-খোপ! তাও ভালো যে বেঁচে ফিরলি।'

ঐভাবেই রইল তারা: নুন-রুটি খায়।... আমিও সেথা ছিলাম, মধু বিয়ার খেলাম, গড়াল মুখ দিয়ে, পড়ে নি পেটে গিয়ে। ছানি নিয়ে যায় বালতি করে, জল বয়ে আনে ছালায় ভরে। বুড়োর মেয়ের বিয়ে হয়েছে. বুড়ির মেয়ে কিন্তু আজ পর্যন্ত আইবুড়ি।

ধর্মবাপ

অনাথ হল তিন ভাই, নেই বাপ, নেই মা। চাল-চুলোও নেই। গাঁয়ে গঞ্জে ঘোরে, খোঁজে কেউ মুনিষ খাটতে নেবে কিনা। যেতে যেতে ভাবে, 'আহ্, মায়াদয়া আছে এমন কোনো মনিব যদি মুনিষ নেয়, বেশ হয়।' দেখে, যাচ্ছে এক বুড়ো, একেবারে থুত্থুড়ে, কোমর পর্যন্ত শাদা দাড়ি। ভাইদের সঙ্গ ধরে বুড়ো শুধোয়:

'কোথায় চলেছ বাছারা?'

ওরা বলে:

'কোথাও মুনিষ খাটতে।'

'তোমাদের নিজেদের কি জোতজমি নেই?'

বলে, 'নেই। দরদি কোনো মনিব পেলে ধম্মমতে তার জন্যে খাটতাম, কথা শুনতাম, আপন বাপের মতো মান্যি করতাম তাকে।'

ভেবেচিন্তে বুড়ো তখন বললে:

'তা বেশ, তোমরা হবে আমার ছেলে, আমি হব তোমাদের বাপের মতো।



তোমাদের মানুষ করে তুলব, ধম্মমতে, বিবেক মতে চলতে শেখাব, কেবল আমার কথা শুনো।'

রাজি হল ভাইয়েরা, গেল বুড়োর সঙ্গে। যায় অন্ধকার বন দিয়ে, তেপান্তর মাঠ দিয়ে। যেতে, যেতে, যেতে — দেখে ছোটো এক কোঠাবাড়ি, ভারি সুন্দর, ধবধবে, চারিদিকে রংবেরঙের ফুলের গাছ। কাছেই একটা চেরি ফলের বাগান। বাগানে একটি মেয়ে, ভারি মিষ্টি, হাসিখুশি, ওই ফুলগুলোর মতোই। বড়ো ভাই তাকে দেখে বললে:

'হ্যাঁ এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারলে হত! আর থাকত যদি বেশ কিছু গরুবলদ!'

বুড়ো তখন বললে:

'তা বেশ, চলো ঘটকালি করি। বৌ হবে তোর, গরুবলদও হবে — সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাস, শুধু ন্যায় পথটা ভুলিস নে।'

গেল তারা, ঘটকালি হল, বিয়ে হল ধুমধাম করে। বড়ো ভাই হল মালিক, বৌকে নিয়ে থাকতে লাগল সেই বাড়িতে।

বুড়ো ওদিকে ছোটো দুই ভাইকে নিয়ে চলল আরো এগিয়ে। যায় অন্ধকার বন দিয়ে, তেপান্তর মাঠ দিয়ে। যেতে, যেতে, যেতে — দেখে ছোটো একটা সুন্দর বাড়ি, ঝলমলে। কাছেই পুকুর, পুকুরে ময়দাকল। আর বাড়ির কাছে মিষ্টি একটি মেয়ে কী যেন করছে — ভারি কর্মী মেয়ে। মেজোভাই তাকে দেখে বললে:

'হ্যাঁ, এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারলে হত! সেই সঙ্গে ময়দাকল আর পুকুরটা যদি পাওয়া যায়। ময়দার জাঁতাকলে বসে গম পিষতাম, খেয়ে দেয়ে বেশ থাকা যেত।'

তখন বুড়ো তাকে বললে:

'তা বেশ বাছা, তোর যখন ইচ্ছে, তাই হোক।'

বাড়িটায় গেল তারা, ঘটকালি হল, বিয়ে হল ধুমধাম করে। নতুন বৌ নিয়ে মেজোভাই থাকতে লাগল বাড়িটায়। বুড়ো তাকে বললে:

'তাহলে বাছা, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, শুধু ন্যায় পথটা ভুলিস না।'

চলল তারা এগিয়ে — ছোটো ভাই আর ধর্মবাপ। যেতে যেতে দেখে — দীনদরিদ্র একটা কুঁড়ে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে ভোর বেলাকার মতো ফুটফুটে একটি মেয়ে, পোশাক-আশাকে একেবারে কাঙাল, কেবল তালি আর তালি। ছোটো ভাই কিন্তু বললে:

'এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারলে হয়। দু'জনে খাটতাম, রুটি জুটত। গরিবদের কথাও ভুলতাম না: নিজেরাও খেতাম, অন্যদেরও ভাগ দিতাম।'

বুড়ো তখন বললে:

'বেশ বাছা, তাই হবে। শুধু দেখিস, ন্যায় পথ ভুলিস নে।'

এরও বিয়ে দিয়ে বুড়ো চলে গেল তার নিজের পথ ধরে।

দিন কাটাতে লাগল ভাইয়েরা। বড়ো ভাই খুব ধনী হয়ে উঠল, ঘরবাড়ি বানাল, মোহর জমাতে লাগল, কেবল ভাবে আরো কত জমানো যায়। আর গরিব লোকদের সাহায্য — সে নিয়ে একেবারে উচ্চবাচ্য নেই — হয়ে উঠল ভারি কৃপণ!

মেজো ভাইও ফেঁপে উঠল: তার হয়ে খাটতে লাগল মুনিষেরা, সে কেবল গড়ায়, খায় দায়, আর হুকুম করে।

ছোটোটা অল্পেস্বল্পে চালায়: বাড়িতে কিছু এলে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে; কিছু না থাকলে, তা না থাকুক — দুঃখু করে না।

এখন, ধর্মবাপ ওদিকে দীনদুনিয়া ঘুরে বেড়াবার পর ঠিক করলে দেখবে ছেলেরা কেমন আছে, ন্যায় পথ থেকে সরে যাচ্ছে কিনা। বুড়ো অভাগার বেশ ধরে সে গেল বড়ো ভাইয়ের কাছে। আঙিনায় ঘুর ঘুর করে, নিচু হয়ে কুর্নিশ করে বলে:

'হুজুর দয়াদাক্ষিণ্যে এই অভাগ্য বুড়োটাকে কিছু খেতে দিন।'

ছেলে কিন্তু বলে:

'কোথায় তুই বুড়ো, ভান করতে হবে না! ইচ্ছে থাকলে বেশ খেটে খেতে পারিস! আমি এই সবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। ভাগ!'

নিজের সিন্দুক তো এদিকে জিনিসপত্রে ফাটে-ফাটে, নতুন নতুন ঘরবাড়ি বানিয়েছে, ভাঁড়ারে মাল ভর্তি, গোলা ভর্তি গম, অগুন্তি টাকাপয়সা। অথচ একমুঠো ভিক্ষেও দিলে না!

শূন্যি হাতে চলে গেল বুড়ো। গেল হয়ত ক্রোশ খানেক, ঢিপির ওপর উঠে চেয়ে দেখল তার বাড়িঘর, বিষয়আশয়ের দিকে, অমনি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

গেল সে মেজো ভাইয়ের কাছে। আছে তার ময়দাকল, পুকুর, ভালোরকমের একটা খামারও। নিজে সে বসে আছে ময়দাকলে। নিচু হয়ে কুর্ণিশ করে বুড়ো বললে:

'এক মুঠো অন্তত ময়দা দাও, দয়াবতার! অভাগা মুসাফির আমি, খাবার কিছু নেই।'

সে বলে, 'ধুর, নিজের জন্যেই আমার এখনো ময়দা পেশা হয় নি! তোমার মতো অনেকেই এখানে ঘুরঘুর করে, সবাইকে খাওয়াতে হলেই হয়েছে আর-কি!'

শূন্যি হাতে চলে গেল বুড়ো। কিছুটা গিয়ে ঢিবির ওপর উঠে ফিরে তাকাল, ধোঁয়া আর আগুনে ছেয়ে গেল ময়দাকল।

ছোটো ছেলের কাছে এল বুড়ো। সে থাকে গরিবের মতো, বাড়িটা ছোটো, তবে ঝকঝকে তকতকে।

বুড়ো বললে, 'বুড়োকে রুটির একটা চটা অন্তত দাও গো ভালোমানুষেরা!'

ছোটো ভাই বললে:

'ভেতরে যাও দাদু, তোমায় সেখানে খাওয়াবে, সঙ্গেও দেবে কিছু।'

বাড়ির ভেতর ঢুকল বুড়ো। গিন্নি তার দিকে তাকিয়ে দেখে লোকটার গায়ে জরাজীর্ণ ন্যাতাকানি পোশাক, কষ্ট হল তার। ভাঁড়ার থেকে কামিজ প্যাণ্ট নিয়ে এসে দিল তাকে। সেগুলো পরল বুড়ো। আর কামিজটা যখন পরছে, কর্ত্রী দেখল তার বুকে মস্তো একটা ঘা। বুড়োকে বসিয়ে তাকে ভালো করে খাওয়াল গিন্নি। তখন বাড়ির কর্তা জিগ্যেস করলে:

'আচ্ছা দাদু, তোমার বুকে অমন ঘা কেন?'

বললে, 'হ্যাঁ, আমার ও ঘা-টা এমন যে শিগগিরই মরব। মরার কেবল একটা দিনই বাকি আছে।'

বৌ বলে, 'কী সর্বনাশ! ও ঘা সারাবার ওষুধ নেই কোনো?'

বুড়ো বলে, 'আছে, তবে দিতে পারলেও কেউ তা দেবে না।'

স্বামী তখন বললে:

'কেন দেবে না? বলো কী ওষুধ?'

'কাজটা কঠিন! কর্তা যদি সমস্ত জিনিসপত্র সমেত তার বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ছাইটা আমার ঘায়ের ওপর ছড়িয়ে দেয়, তাহলে ঘা শুকিয়ে যাবে।'

ছোটো ভাই ভাবনায় পড়ল। ভাবল অনেকখন ধরে, তারপর বৌকে বললে:

'আচ্ছা তুমি কী বলো?'

বৌ বললে, 'মানে, আরেকটা বাড়ি আমাদের হতে পারে। কিন্তু ভালো লোক মারা গেলে আরেকবার তো জন্মাবে না।'

স্বামী বললে, 'তাহলে ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নেওয়া হল, বেরিয়ে এল নিজেরাও। বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটা, নিজেদেরই তো জিনিস, কষ্ট হয় বৈকি। কিন্তু

বুড়োর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল আরো বেশি। দিলে জ্বালিয়ে। আগুন ধরে ...বাড়ি ধ্বসে পড়ল। আর তার জায়গায় দেখা দিল আরেকটা নতুন ধবধবে বাহারে বাড়ি।

বুড়ো ওদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসে।

বললে, 'দেখছি বাছা, তোদের তিনজনের মধ্যে একলা তুই-ই ন্যায়ের পথ ছাড়িস নি। সুখে স্বচ্ছন্দে থাক।'

ছোটো ছেলে তখন চিনতে পারল তার ধর্মবাপকে, ছুটে গেল তার দিকে, কিন্তু সে ততক্ষণে একেবারে অন্তর্ধান করেছে।



বুদ্ধিমতী

ছিল দুই ভাই: একজন গরিব, আরেকজন বড়োলোক। বড়োলোক ভাইয়ের একবার কেমন যেন কষ্ট হল, গরিবটার ঘটি নেই, বাটি নেই, কিছু নেই, তাকে দিলে একটা দুধেলা গরু। বললে:

'একটু একটু করে খেটে শোধ দিও।'

তা ছোটো ভাই তো একটু একটু করে খেটে শোধ দেয়। পরে কিন্তু গরুর জন্যে আফশোস হল বড়োলোকের, গরিবকে সে বলে:

'গরু আমায় ফেরত দাও।'

গরিব বললে:

'তোমার জন্যে যে ভাই খেটে শোধ দিলাম!'

'ও কী আর খাটনি — কেবল লোক-হাসানি! আর গরুটা দেখেছ কেমন! দাও, দাও, ফেরত দাও!'

এত যে খাটল, তার জন্যে দুঃখ হচ্ছিল গরিবের: দিতে চাইল না।



বিচারের জন্যে গেল জমিদারের কাছে। আর কে ঠিক, কার দোষ, তা নিয়ে ভাবতে, মাথা ঘামাতে নিশ্চয় আলিস্যি হচ্ছিল জমিদারের। সে বলে দিলে:

'আমার ধাঁধার যে জবাব দেবে গরু তার।'

'তা বলো গো বাবু।'

'শোনো: দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালো পেট ভরে কিসে, কী সবচেয়ে জোরে ছোটে, কী সবচেয়ে মিষ্টি? কাল এস জবাব দিও।'

চলে গেল ভাইয়েরা। বাড়ি ফিরে ধনী ভাবে, 'ধুর, এ আবার ধাঁধা নাকি! জমিদারের শুয়োরটার চেয়ে কিসে আর পেট ভরে ভালো, জমিদারের শিকারী কুকুরের চেয়ে কে আর বেশি ছোটে, টাকার চেয়ে মিষ্টি আর কী! গরুটা আমিই পাব।'

গরিব ঘরে এল: ভেবে ভেবে আর কুল পায় না, মুষড়ে পড়ে। এখন, তার ছিল এক মেয়ে — মারুসিয়া। সে তখন জিজ্ঞেস করে:

'কী হল বাবা, মুষড়ে পড়েছ কেন? জমিদার কী বললে?'

'ও, জমিদারবাবু এমন ধাঁধা দিয়েছে, মাথা ভাঙার যোগাড়!'

'কী ধাঁধা?'

'ধাঁধা হল সে এইরকম: কিসে সবচেয়ে ভালো পেট ভরে, কী সবচেয়ে জোরে ছোটে, কী সবচেয়ে মিষ্টি?'

'আহ্, বাবা, সবচেয়ে পেট ভরায় মা-ধরণী, সবাইকেই তা খাওয়ায়, দাওয়ায়, সবার পেট ভরায়; সবচেয়ে জোরে ছোটে চিন্তা, মনে মনে যেখানে খুশি উড়ে যাওয়া যায়; সবচেয়ে মিষ্টি হল ঘুম — লোকে যত সুখেই থাক, ঘুমের জন্যে সে সবকিছু ছেড়ে দিতে রাজি।'

বাপ বললে, 'বটে? তা ঠিকই বলেছিস। জমিদারকে আমিও তাই বলব।'

পরের দিন দুই ভাই গেল জমিদারের কাছে। জমিদার শুধাল:

'কী, উত্তর পেলে?'

তাড়াতাড়ি জবাব দেবার জন্যে ধনীর আর তর সয় না, সেই বললে প্রথমে:

'সবচেয়ে খিদে মেটে বাবু আপনার শুয়োরে, সবচেয়ে জোরে ছোটে আপনার কুকুরগুলো, আর সবচেয়ে মিষ্টি — টাকা।'

'এহ্ বাজে কথা!' জমিদার বললে। 'তা, তোমরা কী মত?'

'আজ্ঞে বাবু, সবচেয়ে ভালো খিদে মেটায় মা-ধরণী, সবাইকেই খাওয়ায়, দাওয়ায়, সবারই পেট ভরে।'

'ঠিক, ঠিক!' জমিদার বললে, 'আর সবচেয়ে জোরে কী ছোটে?'

'সবচেয়ে জোরে ছোটে ভাবনাচিন্তা, মনে মনে যেখানে খুশি উড়ে যাওয়া যায়।'

'বটেই তো! আর কী সবচেয়ে মিষ্টি?' জিজ্ঞেস করলে জমিদার।

'সবচেয়ে মিষ্টি ঘুম। লোকে যত সুখেই থাক, ঘুমের জন্যে সে সব ছাড়তে রাজি।'

'সব ঠিক!' জমিদার বললে, 'গরু তোমার। শুধু বলো তো বাপু: নিজেই ভেবে ঠিক করেছ নাকি কেউ বলে দিয়েছে?'

গরিব বললে, 'আমার একটি মেয়ে আছে বাবু — মারুসিয়া। সেই আমায় বলেছে।'

জমিদার রেগে উঠল:

'সে আবার কী! আমি এত বুদ্ধিমান, আর সাধারণ একটা মেয়ে — সে কিনা আমার ধাঁধার উত্তর দেয়! দাঁড়াও! এই রইল দশটা সেদ্ধ ডিম, মেয়েকে দেবে। এগুলোর ওপর সে মুরগি বসাক তা দিতে; তা থেকে এক রাতের মধ্যে বাচ্চা ফুটিয়ে তাদের খাওয়াক, তোমার মেয়ে যেন তাদের তিনটেকে

কেটে ভাজে, আর আমি ঘুম ভেঙে উঠতেই তা নিয়ে আসবে। আমি বসে থাকব। না পারলে তোমার কপাল খারাপ।'

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায় গরিব। এল বাড়িতে, মেয়ে শুধোয়:

'কাঁদছ কেন বাবা?'

'না কেঁদে কী করি বাছা! জমিদার তোকে সেদ্ধ ডিম পাঠিয়েছে, বলেছে, ওগুলো তা দেওয়াবি মুরগিকে দিয়ে, এক রাতের মধ্যেই বাচ্চা ফুটিয়ে মুরগি যেন তাদের খাওয়ায় আর তুই তিনটে বাচ্চা ভাজবি সকালের খাবার জন্যে।'

মেয়ে তখন তাকে এক ভাঁড় মন্ড দিয়ে বললে:

'জমিদারের কাছে এই ভাঁড়টা নিয়ে যাও বাবা, বলবে: উনি জমি চষুন, মন্ডটা বুনুন, জোয়ার গাছ গজিয়ে পেকে উঠলে তা কেটে ঝাড়াই মাড়াই করে সেই দানাগুলো মুরগির বাচ্চা খাওয়াবার জন্যে তৈরি রাখুন যা এই ডিমগুলো ফুটে বেরবে।'

মন্ডটা গরিব নিয়ে গেল জমিদারের কাছে, সেটা দিয়ে জানাল: এই-এই সব বলেছে মেয়েটি।

জমিদার মন্ডটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত তা ছুড়ে দিলে কুকুরদের দিকে। শেষে কোত্থেকে শন গাছের একটা ডাঁটা এনে গরিবকে দিয়ে বললে:

'এই শনের ডাঁটাটা নিয়ে যাও মেয়ের কাছে। এটা সে ভিজিয়ে, শুকিয়ে, থেঁতলে, সুতো কেটে একশ' হাত লম্বা কাপড় বুনে দিক। না পারলে কপাল খারাপ।'

আবার কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায় গরিব। মেয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে শুধোয়:

'কাঁদছ কেন বাবা?'

'এই দ্যাখ: জমিদার তোকে শন গাছের ডাঁটি দিয়েছে, এটা ভিজিয়ে, শুকিয়ে, থেঁতলে, সুতো কেটে একশ' হাত লম্বা কাপড় বুনে দিতে হবে।'

একটা ছুরি নিয়ে মারুসিয়া গাছের সরু একটা ডাল কেটে বাবাকে দিল। বললে:

'এটা বাবা নিয়ে যাও জমিদারের কাছে। বলবে, এই কাঠিটা থেকে সে আমাকে আঁচড়া, চিরুনি, কাঠাম বানিয়ে দিক যাতে শন বোনার মতো কিছু থাকে।'

ডালটা গরিব নিয়ে গেল জমিদারের কাছে, বললে মেয়ে যা বলতে বলেছিল। জমিদার সেটার দিকে চেয়ে থেকে থেকে ছুড়ে ফেলে দিল সেটা। মনে মনে ভাবে, 'এটাকে জব্দ করা দায়! দেখা যাচ্ছে তেমন মেয়ে নয়!' তারপর অনেক ভেবে ভেবে গরিবকে বললে:

'যাও, মেয়েকে গিয়ে বলো: আমার কাছে সে আসুক পায়ে হেঁটেও নয়, গাড়ি করেও নয়, খালি পায়েও নয়, জুতো পরেও নয়, উপহার নিয়েও নয়, না নিয়েও নয়। এটা যদি সে না পারে, কপাল খারাপ।'

কাঁদতে কাঁদতে আবার ফেরে বাপ। এল বাড়িতে, মেয়েকে বলে:

'এবার কী করব বেটি? এই এই হুকুম দিয়েছে জমিদার।' সব কথা বললে তাকে।

মারুসিয়া বললে:

'দুঃখু করো না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাও, আমার জন্যে একটা জ্যান্ত খরগোশ কিনে আনো।'

বাপ গিয়ে কিনল একটা খরগোশ। আর মারুসিয়া তার এক পায়ে পরল ছেঁড়া জুতো, অন্য পা-টা রাখল খালি। তারপর একটা চড়ুই ধরল, স্লেজ নিলে, তাতে জুতল ছাগল। খরগোশকে লুকিয়ে রাখল বগলের তলে, চড়ুই হাতে ধরে একটা পায়ে ভর দিলে স্লেজের ওপর, অন্য পা

রাখল পথে। একটা পা ছাগল টানে, অন্য পায়ে হাঁটে। এইভাবেই সে এল জমিদারের আঙিনায়। আর ঐভাবে তাকে আসতে দেখে জমিদার হুকুম দিলে চাকরদের:

'কুকুর লেলিয়ে দাও ওর দিকে!'

তারাও কুকুর লেলিয়ে দিলে। মারুসিয়া তখন ছেড়ে দিল তার খরগোশ। কুকুররা মারুসিয়াকে ছেড়ে ছুটল খরগোশের পেছনে। মেয়ে তখন জমিদারের দালানে গিয়ে মাথা নুইয়ে বললে:

'এই নিন বাবু আপনার উপহার,' দিল তাকে চড়ুই পাখিটা। জমিদার সেটা নিতে যাবে, মারুসিয়া ছেড়ে দিল চড়ুইকে, সেটাও ফুরুৎ — উড়ে গেল খোলা জানলা দিয়ে।

এইসময় দু'জন চাষি বিচারের জন্যে এল জমিদারের কাছে। তাদের দেখে জমিদার শুধাল:

'কী তোমাদের চাই হে সজ্জনেরা?'

একজন বললে:

'আজ্ঞে বাবু, ব্যাপার এই: আমরা দু'জন মাঠে রাত কাটাই। সকালে উঠে দেখি — আমার ঘুড়িটা বাচ্চা দিয়েছে।'

অন্য লোকটা কিন্তু বলে:

'মিথ্যে কথা: আমারটাই বাচ্চা দিয়েছে! বিচার করুন বাপু!'

অনেক ভেবে ভেবে জমিদার শেষে বললে:

'বাচ্চা আর ঘোড়াদের নিয়ে এসো এখানে — যার দিকে বাচ্চা ছুটে যাবে, সেই বিইয়েছে।'

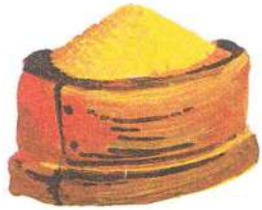
গাড়িতে জোতা ঘুড়িদের নিয়ে আসা হল, ছেড়ে দেওয়া হল বাচ্চাটাকে। আর চাষি দু'জন তাকে এমন ঠেলাঠেলি করতে লাগল আপন আপন দিকে যে বাচ্চাটা ভেবে পেল না কোন দিকে যাবে — বাস, ছুটে পালাল কে জানে

কোথায়। সবাই হতাশ হয়ে পড়ল, কী করা যায়, কী করে ঠিক হবে কার বাচ্চা? মারুসিয়া তখন বললে:

'আপনারা বাচ্চাটাকে বেঁধে রাখুন, আর মায়েদের বাঁধন খুলে ছেড়ে দিন। যে বাচ্চাটার দিকে ছুটে যাবে, সে-ই বিইয়েছে।'

তাই করা হল: বাচ্চাটাকে বেঁধে রেখে ছেড়ে দেওয়া হল ঘুড়িদুটো। একটা ছুটে গেল বাচ্চাটার দিকে, অন্যটা দাঁড়িয়েই রইল।

জমিদার তখন বেশ বুঝতে পারল যে মেয়েটি ভারি বুদ্ধিমতী, কিছুতেই ওকে ঠকানো যাবে না, শান্তিতে রেহাই দিল তাকে।



ন্যায় অন্যায়

দুই ভাই ছিল, তার একজন ধনী একজন গরিব। একদিন দুই ভাইয়ে দেখা, দু'জনে কথাবার্তা হল। গরির বলে:

'যতই কষ্ট হোক, ন্যায় পথেই চলা ভালো।'

ধনী বলে:

'আজকাল ন্যায় কোথায় তুই দেখলি? জগতে আজ আর ন্যায় নেই। যেদিকে দেখো কেবল অন্যায়। অন্যায় পথেই চলা ভালো!'

গরিব কিন্তু নিজের মত ছাড়ে না:

'না ভাই, ন্যায়ই ভালো!'

তখন ধনী ভাই বললে:

'বেশ, বাজি রাখা যাক, লোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করব। যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই জিজ্ঞেস করব — বার বার তিন বার। যদি তোর কথায় সায় দেয় তাহলে আমার সব ধন তোর। আর আমার কথায় সায় দিলে তোর সব ধন আমার।'



গরিব বলে:

'বেশ!'

তাই রাস্তা ধরে চলল ওরা। যেতে যেতে দেখা হল একটা লোকের সঙ্গে — কাজ করে ফিরছে। ওরা বলে:

'কুশল হোক, ভালো মানুষের পো!'

'কুশল হোক।'

'আমরা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই...'

'বেশ তো, বলো!'

'জগতে কী পথে চলা উচিত — ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

লোকটা বলে, 'কী যে বলো ভালো মানুষের পো, আজকাল ন্যায় তোমরা পেলে কোথায়? এই দেখ না, আমি কত খাটলাম কিন্তু মজুরি মিলল না বললেই হয়, সেটুকু থেকেও আবার মালিক কেটে নিলে। ন্যায় পথটা তাহলে কোথায়! ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় পথে চলাই ভালো।'

ধনী ভাই বলে, 'দেখলি তো ভাই, আমার কথাই ঠিক।'

দুঃখ হল গরিব ভাইয়ের। কিন্তু কী আর করে, এগিয়ে চলল। এবার দেখা হল এক সওদাগরের সঙ্গে।

'কুশল হোক তোমার, সাধু সওদাগর!'

'কুশল হোক!'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়...'

'বেশ তো, করো!'

'জগতে কী পথে চলা উচিত: ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

'কী যে বলো, ভালো মানুষের পো, ন্যায় পথে চলছে কে? একটা সওদা বেচতে গেলে শতেক বার ফাঁকি জুকি না দিয়ে বেচাই চলে না।'

এই বলে চলে গেল সে।

ধনী বলে, 'দেখলি তো, দ্বিতীয় লোকটাও আমার পক্ষে!'

আরো মন খারাপ হয়ে গেল গরিব ভাইয়ের। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। যায়, যায়, দেখা হল এক জমিদারের সঙ্গে।

'কুশল হোক, হুজুরের!'

'কুশল হোক!'

'একটা কথা ছিল আপনার কাছে...'

'বেশ তো, বলো!'

'জগতে কী পথে চলা উচিত: ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

'শোন বলি, ভালো মানুষের পো, জগতে আজকাল ন্যায়টা কোথায়? ন্যায় পথে বাঁচা যায় না। ন্যায় পথে চললে কি আর আমি...'

এই বলে কথা শেষ না করেই চলে গেল সে।

ধনী বলে, 'তাহলে ভাই, চল বাড়ি ফিরি, তোর সব ধন আমায় দিয়ে দিবি।'

গরিব ভাই ঘরে ফেরে, দুঃখ তার আর মানে না। ধনী ভাই তার গরিবি সম্বল যা ছিল সব নিয়ে গেল। রইল কেবল কুটিরটি।

বলে, 'ওটায় কিছুদিন তুই নয় থাক, আমার দরকার নেই, তবে তাড়াতাড়ি করে অন্য একটা ঘর দেখিস।'

নিজের সংসারে বসে আছে গরিব। ঘরে এক টুকরো রুটি নেই, কোথাও গিয়ে মজুরি খাটারও উপায় নেই — আকালের বছর। সয়ে থাকে, সয়ে থাকে... কিন্তু কে'দে ওঠে ছেলেমেয়েরা। তাই একটা কুনকে নিয়ে গেল ধনী ভাইয়ের কাছে গম চাইতে।

বলে, 'দে ভাই আমায় এক কুনকে যে কোনো রকমের ময়দা কি দানা। ঘরে খাবার নেই, ছেলেমেয়েরা খিদেয় ফুলে উঠছে।'

ধনী বলে, 'আগে তোর একটা চোখ গেলে দেব, তারপর দেব এক কুনকে ময়দা।'

গরিব ভাবে, ভাবে, শেষ পর্যন্ত রাজি হল।

বলে, 'নে, চোখই না হয় গেলে দে, ভগবান দেখবেন, কেবল খ্রিষ্টের দোহাই যা হোক কিছু খাবার দে।'

ধনী ভাই তার এক চোখ গেলে দিয়ে তাকে এক কুনকে পচা ময়দা দিলে: গরিব ভাই সেটি নিয়ে ঘরে এল। বৌ চেয়ে দেখে দেখে হায় হায় করে উঠল:

'এ কী হল তোমার? চোখ কই?'

বলে, 'কী আর বলি, ভাই এটি গেলে দিয়েছে।'

সব কথা শোনাল বউকে। কান্নাকাটি করলে ওরা, হায় হায় করলে, তারপর ঐ ময়দা খেয়েই দিন কাটাতে লাগল।

কাটল হপ্তা কি তার খানিক বেশি। ফের ফুরিয়ে গেল ময়দা। গরিব ভাই কুনকে নিয়ে ফের গেল ধনী ভাইয়ের কাছে:

বলে, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার, দে বাপু কিছু ময়দা, যা দিয়েছিলি ফুরিয়ে গেছে।'

'অন্য চোখটা গেলে দিই, তবে দেব।'

গরিব বলে, 'দুই চোখ অন্ধ হয়ে জগতে বাঁচব কী করে ভাই? একটা চোখ তো গেলে দিয়েছিস। মায়া কর আমায়, অমনিতেই ময়দা চাট্টি দে!'

ধনী বলে, 'না, এমনি এমনি দেব না। অন্য চোখটা গেলে দিই, তবে দেব।'

সেই কথাই মেনে নিতে হল গরিবকে।

বলে, 'নে, চোখই গেলে দে, তোর ধর্ম তোর কাছে।'

এই বলে চলে গেল সে।

ধনী বলে, 'দেখলি তো, দ্বিতীয় লোকটাও আমার পক্ষে!'

আরো মন খারাপ হয়ে গেল গরিব ভাইয়ের। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। যায়, যায়, দেখা হল এক জমিদারের সঙ্গে।

'কুশল হোক, হুজুরের!'

'কুশল হোক!'

'একটা কথা ছিল আপনার কাছে...'

'বেশ তো, বলো!'

'জগতে কী পথে চলা উচিত: ন্যায় পথে নাকি অন্যায় পথে?'

'শোন বলি, ভালো মানুষের পো, জগতে আজকাল ন্যায়টা কোথায়? ন্যায় পথে বাঁচা যায় না। ন্যায় পথে চললে কি আর আমি...'

এই বলে কথা শেষ না করেই চলে গেল সে।

ধনী বলে, 'তাহলে ভাই, চল বাড়ি ফিরি, তোর সব ধন আমায় দিয়ে দিবি।'

গরিব ভাই ঘরে ফেরে, দুঃখ তার আর মানে না। ধনী ভাই তার গরিবি সম্বল যা ছিল সব নিয়ে গেল। রইল কেবল কুটিরটি।

বলে, 'ওটায় কিছুদিন তুই নয় থাক, আমার দরকার নেই, তবে তাড়াতাড়ি করে অন্য একটা ঘর দেখিস।'

নিজের সংসারে বসে আছে গরিব। ঘরে এক টুকরো রুটি নেই, কোথাও গিয়ে মজুরি খাটারও উপায় নেই — আকালের বছর। সয়ে থাকে, সয়ে থাকে... কিন্তু কে'দে ওঠে ছেলেমেয়েরা। তাই একটা কুনকে নিয়ে গেল ধনী ভাইয়ের কাছে গম চাইতে।

বলে, 'দে ভাই আমায় এক কুনকে যে কোনো রকমের ময়দা কি দানা। ঘরে খাবার নেই, ছেলেমেয়েরা খিদেয় ফুলে উঠছে।'

ধনী বলে, 'আগে তোর একটা চোখ গেলে দেব, তারপর দেব এক কুনকে ময়দা।'

গরিব ভাবে, ভাবে, শেষ পর্যন্ত রাজি হল।

বলে, 'নে, চোখই না হয় গেলে দে, ভগবান দেখবেন, কেবল খিৃষ্টের দোহাই যা হোক কিছু খাবার দে।'

ধনী ভাই তার এক চোখ গেলে দিয়ে তাকে এক কুনকে পচা ময়দা দিলে: গরিব ভাই সেটি নিয়ে ঘরে এল। বৌ চেয়ে দেখে দেখে হায় হায় করে উঠল:

'এ কী হল তোমার? চোখ কই?'

বলে, 'কী আর বলি, ভাই এটি গেলে দিয়েছে।'

সব কথা শোনাল বউকে। কান্নাকাটি করলে ওরা, হায় হায় করলে, তারপর ঐ ময়দা খেয়েই দিন কাটাতে লাগল।

কাটল হপ্তা কি তার খানিক বেশি। ফের ফুরিয়ে গেল ময়দা। গরিব ভাই কুনকে নিয়ে ফের গেল ধনী ভাইয়ের কাছে:

বলে, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার, দে বাপু কিছু ময়দা, যা দিয়েছিলি ফুরিয়ে গেছে।'

'অন্য চোখটা গেলে দিই, তবে দেব।'

গরিব বলে, 'দুই চোখ অন্ধ হয়ে জগতে বাঁচব কী করে ভাই? একটা চোখ তো গেলে দিয়েছিস। মায়া কর আমায়, অমনিতেই ময়দা চাট্টি দে!'

ধনী বলে, 'না, এমনি এমনি দেব না। অন্য চোখটা গেলে দিই, তবে দেব।'

সেই কথাই মেনে নিতে হল গরিবকে।

বলে, 'নে, চোখই গেলে দে, তোর ধর্ম তোর কাছে।'

ধনী ভাই তার অন্য চোখটাও গেলে দিয়ে ময়দা ঢেলে দিলে কুনকেতে। ময়দা নিয়ে অন্ধ ভাই ঘরে ফিরল।

বেড়া ধরে ধরে হাতড়ে হাতড়ে কোনোক্রমে তো ঘরে এল। বৌ তাকে দেখেই আতঙ্কে শিটিয়ে গেল:

'ওগো আমার দীন দুঃখী, অন্ধ হয়ে জগতে বাঁচবে কী করে? অন্য কোনো জায়গা থেকেও তো ময়দা যোগাড় করা যেত, কিন্তু এখন...'

এমন বুক ফাটা কান্না কাঁদলে যে মুখ দিয়ে আর কথা ফুটল না। অন্ধ বলে:

'কেঁদো না বৌ, সংসারে এক আমিই তো আর অন্ধ নই। অনেক অন্ধ আছে, চোখ না থাকলেও তো বেঁচে থাকছে।'

এ ময়দাও শিগগিরই ফুরিয়ে গেল। কুনকে কি আর অনেক? একটা। পেট কি আর কম? গোটা সংসার!

অন্ধ বলে, 'এবার বৌ, ভাইয়ের কাছে আর যাব না। তুমি আমায় গাঁ ছাড়িয়ে সড়কের বড়ো পপলার গাছটার কাছে দিয়ে এসো, সারা দিনের পর সন্ধ্যায় এসে আমায় নিয়ে যাবে; সওয়ারী পথচারী সবাই হয়ত বা রুটির টুকরো ভিক্ষে দেবে।'

বৌ তাকে নিয়ে গিয়ে পেঁছে দিল পপলার গাছটার নিচে, নিজে ফিরে এল ঘরে।

লোকটা বসে থাকে। একটা কপর্দক সে ভিক্ষে পেয়েছিল কারো কাছ থেকে। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে, বৌ আসে না। লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ভাবল একা একাই বাড়ি ফিরবে, কিন্তু পথ ভুল করে অন্য দিকে চলে গেল। যায়, যায়, কিন্তু জানে না কোন দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ শোনে মাথার ওপরে বনের শনশন। বোঝা গেল বনেই রাত কাটাতে হবে। বুনো

জানোয়ারের ভয় ছিল, তাই কোনো রকমে একটা গাছে উঠে বসে রইল লোকটা।

ঠিক যখন রাত দুপুর তখন হঠাৎ ঠিক এই জায়গাটিতে ঠিক এই ওকগাছের নিচেই এসে জুটল যত ভূতপ্রেত আর তাদের সর্দার। সর্দার জিজ্ঞেস করে, কে কী করেছে? একটা ভূত বলে:

'দুই কুনকে ময়দার জন্যে ভাইকে দিয়ে ভাইয়ের চোখ গালিয়ে দিয়েছি আমি।'

সর্দার বলে:

'ভালোই করেছিস, তবে তেমন খাসা নয়।'

'সে কী?'

'সে অন্ধ যদি এই গাছের তলাকার শিশির চোখে বুলোয়, তবে দৃষ্টি ফিরে পাবে।'

'কিন্তু এ উপায়ের কথা কেই বা শুনেছে, কেই বা জানে?'

'আর তুই কী করলি?' অন্য একটা প্রেতকে জিজ্ঞেস করে সর্দার।

'আমি এক গাঁয়ে গিয়ে সব জল শুকিয়ে দিয়েছি, একটি বিন্দুও পড়ে নেই। জল আনতে হবে এবার নয়-দশ ক্রোশ দূর থেকে। অনেক লোকেই মারা পড়বে।'

'ভালোই করেছিস, তবে খুব খাসা নয়।'

'সে কী?'

'কাছের শহরে যে পাথরটা আছে সেটা যদি কেউ সরিয়ে দেয় তাহলে সেখান থেকে জল বেরুবে, তাতে গোটা গাঁয়ের কুলিয়ে যাবে।'

'কিন্তু এ উপায়ের কথা কেই বা শুনেছে, কেই বা জানে?'

'আর তুই কী করলি?' জিজ্ঞেস করে তৃতীয় প্রেতকে।

'এক দেশের এক রাজার একটি কন্যে। কন্যেটিকে অন্ধ করে দিয়েছি আমি, কোনো ওষুধেই কিছু হবে না।'

'ভালোই করেছিস, তবে খুব খাসা নয়।'

'সে কী?'

'এই গাছের নিচেকার শিশির যদি ওর চোখে বুলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে দৃষ্টি ফিরে পাবে।'

'কিন্তু এ উপায়ের কথা কেই বা শুনেছে, কেই বা জানে?'

লোকটা ওদিকে গাছের ওপর বসে বসে সব কথা ওদের শুনলে। ভূতপ্রেতেরা চলে যেতেই ও গাছ থেকে নেমে সেই শিশির নিয়ে চোখে বুলাল। অমনি ফিরে পেল দৃষ্টি। ভাবলে, 'এবার গিয়ে সাহায্য করব লোকেদের।' তারপর জল খাবার ভাঁড়ে সেই গাছের শিশির যোগাড় করে রওনা দিলে।

গেল সেই গাঁয়ে যেখানে জল নেই। দেখে কি, বাঁকে করে বালতি নিয়ে চলেছে এক বুড়ি। তাকে নমস্কার করে বলে:

'বুড়ি মা, একটু জল দাও আমায়!'

'আরে বাছা, এ জল আমি আনছি দশ ক্রোশ দূর থেকে, বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতেই তার অর্ধেক ছলকে পড়বে। সংসার আমার তো ছোটো নয় — জলের তেষ্টায় মারা পড়বে।'

'তোমাদের গাঁয়ে যখন যাব তখন সবাইকে জল খাওয়াব।'

বুড়ি তাকে জল দিলে খেতে। এত তার আনন্দ হল যে অমনি সারা গাঁয়ে ছুটোছুটি করে এই লোকের কথা বললে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, কিন্তু সবাই ছুটল তাকে দেখতে, নমস্কার করে বলে:

'ভালো মানুষের পো, মরণ থেকে আমাদের বাঁচাও!'

বলে, 'বেশ, তবে সাহায্য করো আমায়। নিয়ে চলো তোমাদের কাছাকাছি শহরটায়।'

নিয়ে গেল তারা ওকে। ও তখন খোঁজে খোঁজে, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল সেই পাথরটা। সবাই তখন দল বেঁধে লেগে গেল পাথর ওঠাতে, পাথর সরাতে। ...আর যেই না পাথর সরল অমনি তার তল থেকে কলকলিয়ে উঠল জল। সে স্রোত এগোয় আর এগোয় আর যত ঝর্ণা, যত পুকুর, যত নদী সব কানায় কানায় ভরে ওঠে। লোকের আনন্দ আর ধরে না, মানুষটাকে ধন্যি ধন্যি করে তারা সব টাকাপয়সা উপহার উপঢৌকন দিলে তাকে।

ঘোড়ায় চেপে সে রওনা দিলে। সেই সে রাজ্যের পথ জিজ্ঞেস করে কেবল, রাজকন্যে যেখানে অসুস্থ। গেল অনেক পথ নাকি অল্প পথ কে জানে — শেষ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছিল।

রাজপ্রাসাদে গিয়ে নোকরদের জিজ্ঞেস করে:

'শুনেছি তোমাদের রাজকন্যের নাকি অসুখ? আমি হয়ত সারাতে পারব।'

'কী যে বলো, বাপু! রাজবদ্যির ওষুধে কিছু হল না, তুমি আর নাক ঢোকাতে এসো না।'

'তবু একবার রাজাকে বলে দ্যাখো!'

ওদের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা — বলো গিয়ে বাপু রাজাকে। কী আর করে, রাজাকে গিয়ে বললে। রাজা তাকে ডেকে পাঠালে প্রাসাদে।

বলে, 'তুমি আমার কন্যেকে ভালো করে দিতে পারবে বলছ?'

'পারব,' জবাব দেয় লোকটা।

'যদি পারো তবে যা চাও তাই দেব।'

রাজকন্যে যে ঘরে শুয়েছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হল লোকটাকে। সে তার শিশির বুলিয়ে দিলে রাজকন্যের চোখে। অমনি দৃষ্টি পেল রাজকন্যে। রাজা তখন এমন খুশি হল বলার নয়। এত ধনসম্পদ দান করলে যে সারি সারি গাড়ি দিয়ে তা বইতে হল।

ওদিকে তার বৌ কিন্তু দুঃখে মরে, অভাবে অনটনে দিন কাটায়, জানে না কোথায় তার স্বামী। ভাবছে, বেঁচে আর নেই। হঠাৎ এসে হাজির সে, জানলায় টোকা দেয়:

'দোর খোল, বৌ!'

গলার স্বর শুনেই চিনলে। আনন্দ আর ধরে না। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ঘরে নিয়ে আসে, ভাবে বুঝি অন্ধ।

'আলো জ্বাল!' বলে লোকটা।

আলো জ্বাললে বৌ। তাকিয়ে দেখতেই অবাক হয়ে হাত দোলালে সে। এ যে দৃষ্টিমন্ত মানুষ!

'সে কী, জয় ভগবান! এমন কান্ড করলে কী করে, বলো তো!'

'দাঁড়াও বৌ, ধনদৌলতগুলো আগে ঘরে তুলি।'

সম্পদ সে যা ঘরে তুলল, তার কাছে কোথায় লাগে তার ধনী ভাইয়ের দৌলৎ!

ধনী হয়ে তারা দিন কাটায়। সব খবর পেয়ে ধনী ভাই ছুটে এল:

'সে কী ভাই, তোর দৃষ্টি ফিরেছে, ধনী হয়ে উঠেছিস?'

ভাই কিছু না লুকিয়ে সব বললে: এই হয়েছিল, সেই হয়েছিল।

ধনী ভাইয়ের তখন লোভ হল আরো ধন হয় কীসে। রাত হতেই সে চুপিচুপি ছুটে গেল সেই বনে, চেপে বসে রইল সেই গাছে। মাঝরাত হতেই হঠাৎ উড়ে আসে ভূতপ্রেত আর তাদের সর্দার। বলাবলি করে:

'সে কী, কেউ শোনে নি, কেউ জানে না, অথচ অন্ধ ভাই দেখি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, পাথরের তল থেকে জল বেরিয়েছে, রাজকন্যে সেরে উঠেছে। নিশ্চয় কেউ আড়ি পেতে শুনেছে আমাদের কথা। আয় খুঁজে দেখি!'

খুঁজতে শুরু করলে সবাই। গাছে উঠে দেখে সেই ধনীটা। জাপটে ধরে তাকে কুচিকুচি করে ফেললে তারা।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার

মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers

17, Zubovsky Boulevard

Moscow 119859, Soviet Union

ISBN 5-05-001771-8

ইউক্রেনের লোককথা